KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 24, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : 9/- 9/- 9/- 9/- 9/-	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ আষাঢ়, ১৩৫৫ শ্রাবণ, ১৩৫৫ ভাদ্র, ১৩৫৫ আশ্বিন, ১৩৫৫
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

a distinguished tea

Brooke Bond Choicest Tea

SPECIAL HIGH GROWN DARJEELING BLEND

Here's tea at its best from the best tea people

Look for this Blue and Yellow tin

Brooke Bond India Private Limited

আশ্বিন সমকালীন ১৩৬৬

॥ সূচীপত্র ॥

বঙ্কিম-মনীষা ॥ ভবতোষ দত্ত ৩৪১

বিভেদ ও মৌলিকতা ॥ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫৩

লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় সংস্কৃতচর্চা ॥ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী ৩৫৭

ইতিহাসং পুরাতনম্ ॥ কল্যাণী দত্ত ৩৬৭

আলেকজাণ্ডার সোমা দ্য করোস ॥ সোমেন বসু ৩৭৪

সমাজউন্নয়নে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা ॥ পবিত্র পাল ৩৮১

সান্নিধ্য ॥ চিন্তামণি কর ৩৮৮

এবার ফিরাও মোরে ॥ রাখাল ভট্টাচার্য ৩৯৩

আধুনিক কবিতা সমালোচনা প্রসঙ্গে ॥ ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৩৯৯

সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা ॥ পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪০৪

জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে শিশিরকুমার ॥ রবি মিত্র ৪০৬

সমালোচনা—পরেশনাথ ভাট্টাচার্য ৪০৮

॥ সম্পাদক ; আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আসামের অগ্রগতি

আসামে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও বন্যানিয়ন্ত্রণমূলক কর্মসূচী বাদ দিয়ে কেবলমাত্র দ্বিতীয় পাঁচ-সালা পরিকল্পনার ব্যয়বাবদ ৬০ কোটী টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে রাজ্যের আয় ১৫·৮% হারে ও মাথাপিছু আয় ৯·২% হারে বর্দ্ধিত হইবে। সম্পাদিত ব্যাঘাশ ব্যতীত মোট ব্যয়ের ৪০ কোটী টাকা গ্রামাঞ্চলের জন্য খরচ করা হইবে।

॥ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত জরুরী কর্মসূচী ও কতকগুলি সম্পাদিত কর্মের পরিচয় ॥

* বাড়তি ৮৩০ মাইল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও জাতীয় সড়ক রাষ্ট্রীয়করণ হইবে ও ইহার দ্বারা দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে আসামে মোট ৫৩৭টি যানবাহন সমেত ১৪৩০ মাইল সড়ক রাষ্ট্রীয় আয়ত্বাধীনে আসিবে।

* পাওয়ার প্ল্যাণ্টগুলির বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতা ১৮,৩১৫ কিলোওয়াট পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া ২৫টি নূতন সহর ও ২১টি গ্রাম বৈদ্যুতীকরণ হইবে।

* ৩·৮২ লাখ টন সমপরিমাণ বাড়তি খাদ্য-শস্য উৎপন্ন করা হইবে।

* ১৫২ ব্লক সমেত সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনাকে এরূপে বর্দ্ধিত করা হইবে যাহাতে পুরা দেশ সমগ্র-ভাবে উপকৃত হয়।

* কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থা সহ ১০০টি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও ৭০০টি নিম্ন বিদ্যালয় স্থাপন ও গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ করা হইবে।

* বস্ত্রকল, পাটকল, রেশমকল, চিনিকল প্রভৃতি বহৎ ও মাঝারি বহৎশিল্প ব্যবস্থায়ের পত্তন হইবে।

* বাড়তি ১০০০ শয্যা সম্বলিত হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয় ও ৪০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হইবে।

* রাজ্যের সমতলভাগের জেলাগুলিতে পঞ্চায়েৎ প্রথা চালু ও ৩৭টি আদালতি-পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

* বাড়তি ১১,০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপন্ন করা হইয়াছে এবং ২৬টি শহর ও গ্রামের বৈদ্যুতিকরণ দ্বারা প্রায় ৪০০ বর্গ-মাইল উপকৃত হইয়াছে।

* ৬১টি বীজ-গোলা স্থাপন ও ৫৮,৭৩০ টন পরিমাণ বাড়তি খাদ্যশস্য পাওয়া গিয়াছে।

* ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা দ্বারা ৩,০৩,৭৩১ একর জমি সেচ করা হইয়াছে।

* কুটীরশিল্প-ঋণ হিসাবে ৮ই লাখ টাকা বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিতরণ ও ৮টি কুটীরশিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন হইয়াছে।

* বিভিন্ন হাঁসপাতালে ৩১০টি বাড়তি শয্যার সংযোজন, ৪৪টি প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র ও ৪০টি পরিবারনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

* নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য ১৪০টি ও উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য ২০টি গৃহ নির্মিত হইয়াছেও ২০,১৪৩ জন শিক্ষক বর্দ্ধিত হারে বেতনের সুবিধা পাইয়াছেন।

* ১২০টি বৃহৎ সমবায় সমিতি ও ২,৮০০টি ক্ষুদ্রাকারের সমিতি গঠিত হইয়াছে।

পরিকল্পনার সাফল্যের মূলে আছে জনসাধারণের সহযোগিতা

আসাম সরকারের বিবরণী ও প্রচার দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত

বঙ্কিম-মনীষা

ভবতোষ দত্ত

এ যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষার মূল্যমান সম্পর্কে বিচিত্র দ্বিধা দেখা দিয়েছে। বঙ্কিম একটা যুগের একটি সম্প্রদায়ের চিন্তানায়কত্ব করে গেলেও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অগ্রগতির পক্ষে তাঁর নির্দেশ সহায়ক হয়েছিল কিনা, এ বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। এ-কথা সত্য ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের সৃষ্টি বিভিন্ন যুগে নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে বারবার নতুন হয়ে উঠবে কিন্তু চিন্তার মূল্য বাস্তব জীবনের ভূমিকাতে বিশেষ করে যে চিন্তা নিছক তাত্ত্বিক বা দার্শনিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাও মানুষকে নিয়েই। এই জন্য বঙ্কিমের প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন আরও কঠিন।

প্রতি যুগেই জীবনের মূল্যমান নিয়ে তার নিজের আদর্শ গড়ে ওঠে। মনীষার পরিমাপ করা সম্ভব হয় সেই আদর্শ দিয়ে। যুগগত আদর্শ এবং ব্যক্তিগত মনীষার সঙ্গতি হলেই যে সে শ্রেষ্ঠত্ব স্থিরীকৃত হল তা' নয়। অতীত এবং বর্তমানের তুলনাতেই তার সার্থকতা নির্ণেয়। সর্বদাই দেখা যায় ইতিহাস মোড় ফিরছে। আজ যা আধুনিক কাল তা পুরাতন। সে ক্ষেত্রে চিন্তার বৈশিষ্ট্য নিরুপণই সবচেয়ে নিরাপদ এবং ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞোচিত নয়। ভবিষ্যতের পথ যদি রুদ্ধ না হয়, চিন্তায় এবং বিশ্বাসে যদি জড়ত্বের সৃষ্টি না হয়—তা হলেই মনীষার গৌরব। এক এক যুগে এক একটি চিন্তাকেন্দ্রে মানুষের মন বিশ্রাম পায়, কিন্তু পান্থশালা মানেই বন্দীশালা নয়। বঙ্কিমের মননেও বাঙ্গালী তেমনি আশ্রয় পেয়েছিল কিন্তু বন্দী হয় নি। রবীন্দ্রনাথের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের পর এই সত্যটি স্বীকৃত হল।

বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের ত্রিশ বৎসর আগে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে নব্যবঙ্গদের মুখপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই দ্বৈভাষিক পত্রিকায় সে যুগের বিশিষ্ট চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছিল। বঙ্কিমের পত্রিকা এবং নব্যবঙ্গদের এই পত্রিকার নামসাদৃশ্য লক্ষণীয়। নিজের নিজের সময়ের বাংলা দেশের জীবনদর্শনকে ভাষা দেওয়াই যেন দুটি পত্রিকারই উদ্দেশ্য ছিল। বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকা যেমন আধুনিক যুগের প্রথম প্লাবনের চিহ্ন বহন করছে, বঙ্গদর্শন তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মননসম্প্রদায়কে ধারণ করে রয়েছে। ইতিহাসচেতনা, ধর্মনীতি, চারিত্রনীতি, সাহিত্যাদর্শ—ইত্যাদি যে সব দিক্ দিয়ে বাঙালী মূল্যবোধের সৃষ্টি করে তুলছিল বঙ্গদর্শন তাদের ভাষা দিচ্ছিল। বঙ্কিম-

চন্দ্রের প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনেই প্রথম প্রকাশিত হল। কিন্তু বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকা যে স্বাধীন চিন্তা এবং সংস্কারমুক্ততার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করে বঙ্কিম তার আদর্শ অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন কিনা, সেটাই আমাদের বিচার্য।

বঙ্কিমের মনীষার জাগরণ এবং পুষ্টি নব্যবঙ্গের আন্দোলনের কিছুকাল পরে হয়েছিল নীল-বিদ্রোহ এবং সিপাহী বিদ্রোহের যুগে। হুগলী কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এই সময়ে তিনি বিবাহ আন্দোলন এবং বাংলা সাহিত্যের উন্মেষও দেখেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। দেশের সংবাদ এবং ভাবের ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় হয়েছিল। বঙ্কিম যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ আধুনিক। সংস্কৃত কলেজ ছাড়া আর কোনো কলেজে সংস্কৃত পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না, বঙ্কিমের সংস্কৃত শিক্ষাও স্কুল কলেজে হয় নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, বঙ্কিম বাড়ীতে বা টোলে সংস্কৃত শেখেন। ইতিহাস চর্চার প্রতি তাঁর আবাল্য অনুরাগের কথা জানা যায়। বঙ্কিম-মনীষার ইতিহাস আশ্রয়ের প্রবণতা এই সংবাদ সত্য বলে ধরে নিতে বাধা নেই। দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের কিংবা অন্ধ প্রাচীন পন্থা অনুবর্তনের আনুকূল্য তিনি কোথাও বিশেষ পান নি। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পড়তে তিনি ভালোবাসতেন কিন্তু মনীষার উত্তরাধিকার ঈশ্বর গুপ্তের থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির অনুপযোগিতার কথা তিনি ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীতেই (১৮৮৫) উল্লেখ করেছিলেন। অন্যত্রও সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া কবিওয়ালাদের গানের এবং রুচির নিন্দা করেছিলেন।[১]

সে যুগের কথা চিন্তা করলে বঙ্কিমের এই শিক্ষা এবং রুচি স্বাভাবিকই ছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেকলে ভারতবাসীর জন্য আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা করলেন। নব্যবঙ্গেরা ইতিপূর্বে এই শিক্ষা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা যখন শিক্ষা লাভ করছেন তখন পর্যন্ত কোনো সর্বসম্মত শিক্ষানীতির প্রয়োগ ছিল না। হিন্দু কলেজে আধুনিক চিন্তাকে প্রবাহিত করে নিয়ে আসার সব রকম আয়োজনই ছিল সত্য কিন্তু যুক্তিবাদিতা এবং নৈতিক বুদ্ধির মানদণ্ড ছাড়া কোনো একাভিমুখী শিক্ষাবিধি ছিল না। ডিরোজিওর প্রভাবে স্বাধীন চিন্তাশক্তির স্ফুরণ ঘটল কিন্তু সেই শক্তি কোন কাজে প্রযুক্ত হয়েছিল? সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় (১৮৩৮) আলোচনা প্রসঙ্গে দেশের ইতিহাস এবং সমাজ ইত্যাদির আলোচনা হয়েছে। এই সব আলোচনা বিচ্ছিন্নভাবে অভিনব এবং সুষ্ঠু, কিন্তু সম্মিলিতভাবে তাদের সামগ্রিক লক্ষ্য ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে জর্জ টমসন এদেশে এসে এই অভাব বুঝতে পেরেছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন

'ইংরাজী লেখাপড়ার ফলও ঐ সময় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া প্রতীয়মান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।' কতকগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি একটি সভা করিয়া (Society for the Diffusion of Useful Knowledge) প্রচলিত ধর্ম প্রণালী সামাজিক প্রণালী এবং শাসন প্রণালীর বিষয়ে যে সকল রচনাবলী এবং বক্তৃতা প্রচারিত করেন তাহা দেখিলে বোধহয় যে ইউরোপীয় মত সকল ক্রমশঃ এ দেশে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে ঐ সময়ে বক্তৃতায় যে প্রকার আড়ম্বর, কার্যের উদ্যোগ তাহার সহস্রাংশের একাংশও হয় নাই।.....রাজধানীতে ইংরাজী বিদ্যার চর্চাবাহুল্য হওয়াতে ক্রমশঃ এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ পূর্বাপেক্ষায় প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। বিশেষতঃ জর্জ টমসন নামা যে মহাত্মা ঐ সময়ে এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন, উহার বাগ্মিতা প্রভাবে এখনকার যুবদল একেবারে নূতন মূর্তি ধারণ করিয়া উঠিলেন। প্রকৃত শুভানুধ্যান করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইলেন।"[২]

(১) বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, বিবিধ (সাহিত্য পরিষৎ) পৃঃ ৩৪৭

(২) ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাস' (১৯০৩), প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়

এই নব্যবঙ্গের দল রামমোহনের আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিল। কিন্তু রামমোহনের সঙ্গে নব্যবঙ্গের চিন্তাপদ্ধতির পার্থক্যও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। রামমোহনের মধ্যে যে স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটেছিল, নব্যবঙ্গের সঙ্গে তার মিল মূলত সামান্যই ছিল। এ কথা মনে রাখা দরকার রামমোহনের ইংরেজী জ্ঞান স্বোপার্জিত এবং তাও পরবর্তীকালে। তিনি ফার্শী এবং সংস্কৃত-পড়া মানুষ। তাঁর শাস্ত্রালোচনা-পদ্ধতি দেখে এটাই মনে হয়, উদ্দেশ্য যাই হোক তাঁর চিন্তা-পদ্ধতির মূল দেশীয় পাণ্ডিত্যের ভূমিতে। নৈয়ায়িকের পদ্ধতিতে তিনি তর্ক করেছেন, প্রমাণ খুঁজেছেন দেশীয় শাস্ত্রের ঐতিহ্যে। রামমোহনের মতো যুক্তিবাদী দার্শনিক আমাদের দেশে অবিরল। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার মতো এমন অপরিচিত বস্তু ইতিপূর্বে আর আসে নি। য়ুরোপে রেনাশাঁর পর থেকে মানুষের চিন্তাশক্তি যে সব পথ প্রস্তুত করে চলেছিল, রামমোহনের রচনায় তার কোনোটার সঙ্গেই কি সাদৃশ্য পাওয়া যায়? তাঁর বিচার-রীতি মূলত স্কলাসটিক। চিন্তানায়ক হিসাবে রামমোহনের মহৎ গৌরব এই যে মধ্যযুগীয় স্কলাসটিকদের বিচারকে এমন একটা উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োগ করলেন যা আমাদের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ করে। যে রক্ষণশীল পণ্ডিতদল সতীদাহের সমর্থন করেছিলেন, বিচারপদ্ধতিতে তাদের সঙ্গে রামমোহনের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। লক্ষ্যনির্ণয় করবার দৃষ্টি-মত্তাতেই রামমোহনের অসাধারণত্ব; সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল বলেই তাঁর জীবনদর্শন সুস্পষ্ট সমগ্র এবং সম্পূর্ণ।

নব্যবঙ্গের সঙ্গে রামমোহনের তুলনা করতে হলে এই দুটি দিক দিয়েই করতে হবে। নব্য-বঙ্গের লক্ষ্য সুস্পষ্ট ছিল না, তাই জীবনদর্শনেও সমগ্রতা আসে নি কিন্তু তাঁদের চিন্তাপদ্ধতি স্কলাসটিক ছিল না। ইতিহাসের তথ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করেছেন, শাস্ত্রবচনকে উপেক্ষা করেছেন আর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন সংস্কারমুক্ত সহজ বুদ্ধির উপর। ভেভিড হেয়ারের জীবনীতে প্যারীচাঁদ মিত্র বলেছেন ডিরোজিওর কাছে নব্যবঙ্গের দল টমাস ব্রাউন, ডুগাল্ড্ স্টুয়ার্ট, ডক্টর রীড প্রভৃতির দর্শন শিক্ষা করত। দর্শনের ইতিহাসে এদের মতকে স্কটিশ ফিলজফি বলা হয়। এরা আর একটি নামেও পরিচিত—Common Sense School। এদের চিন্তার বিশেষত্ব হচ্ছে প্রধানত তিনটি :

I. It proceeds on the method of observation professedly and really. In this respect it is different from nearly all the philosophies which went before, from many of those which were contemporary, and from some of those which still linger among us. The method pursued in Eastern countries, in ancient Greece and Rome, in the scholastic times and in the earlier ages of modern European speculation had not been that of induction either avowedly or truly.....To the Scottish school belongs the merit of being the first, avowedly or knowingly, to follow the inductive method and to employ it systematically in psychological investigation.

II. It employs self consciousness as the instrument of observation.

III. By the observation of consciousness principles are reached which are prior to independent of experience.

এক কথায় বলতে গেলে স্কটিশ দার্শনিকেরা ছিলেন গোঁড়ামিবর্জিত মুক্ত বুদ্ধির পক্ষপাতী। ফ্রান্সিস বেকনের নবোদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ এঁরা যেমন করেছিলেন তেমনি অভিজ্ঞতাবাদী এম্‌পিরিসিস্ট এবং মননবাসী র‍্যাশনালিস্টদের সঙ্গেও যোগ রক্ষা করে চলেছিলেন।

It agrees with the former in holding that we can construct a science of

mind only by observation and out of the facts of experience but then it separates from them in as much as it resolutely maintains that we can discover principles which are not the product of observation and experience.[3]

সুতরাং এদের চিন্তাপদ্ধতিতে রেণাশী-পরবর্তী পাশ্চাত্য-মনন-রীতির সবগুলি বিশেষত্বই প্রকাশ পেয়েছিল। নব্যবঙ্গের পক্ষে যা আংশিক সত্য—তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না— স্কটিশ দার্শনিকদের সম্পর্কে সেটা সত্য নয়। কিন্তু এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্য থেকে মুক্ত করে, র‍্যাশনালিজমের সহজ প্রজ্ঞা এবং এমপিরিসিজমের আহৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বেকনের আরোহ পদ্ধতি মিলিয়ে তাদের দর্শনের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। ডিরোজিওর বিরুদ্ধে হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষ যে অভিযোগ এনেছিলেন, তার উত্তরে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, হিউমের নাস্তিক্যবাদের সঙ্গে যেমন তিনি ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তেমনি স্কটিশ দার্শনিকদের যুক্তিগুলিও সমানভাবেই উপস্থাপিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, রামমোহন নিজে পণ্ডিতী রীতিতে যুক্তিজাল বিস্তার করলেও আধুনিক চিন্তাপদ্ধতিতে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর বিখ্যাত শিক্ষা-বিষয়ের পত্রে তিনি বেকনের প্রবর্তিত যুক্তিপন্থার বিস্তার কামনা করেছিলেন। রামমোহনের কামনা সার্থক হয়েছিল নতুন ইংরেজি শিক্ষিতদের দ্বারা। বেকনের পদ্ধতিকেই তারা গ্রহণ করল। তাদের আলোচিত বিষয় ইতিহাস-সম্মত বিন্যাসে সজ্জিত হল। তথ্য সংগ্রহ এবং সাধারণ নীতি নির্ধারণ করবার চেষ্টা করে বৈজ্ঞানিক রীতির প্রতি প্রবণতা দেখাল তারা। বিশেষত এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার ফলে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের আলোচনা পদ্ধতির প্রবল প্রভাব পড়ল নবশিক্ষিতদের উপর। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ থেকে খুব সংগতভাবেই এ রকম ধারণা জন্মে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত বেথুন সোসাইটিকে এরই উত্তরাধিকার বহন করতে দেখি। বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাজীবনে অক্ষয়কুমার দত্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীরা আমাদের জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের উক্তি কৌতূহলোদ্দীপক ঃ 'আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার সম্বন্ধ আর সে খুঁজিতেছে বাহ্যবস্তুর সহিত মানবের সম্পর্ক'। আমি কোথায় আর সে কোথায়।' অক্ষয়কুমারের মনীষায় যুগের একটা বড়ো লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল—প্রকৃতি এবং মানবের সম্পর্ক সন্ধানের ঔৎসুক্যে। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগ সম্বন্ধে বলেছিলেন

The very idea that external life is a worthy subject of the attention of a national being, except in its connections with religion, i.e. amongst ourselves, unmistakably of English origin.[4]

—জড়প্রকৃতিই মানুষের পর্যবেক্ষণের বিষয়, ঈশ্বর বা আত্মা নয়। এই অনুসন্ধানে নৈয়ায়িক পদ্ধতি বর্জিত হল। প্রকৃতি বিচারের আধুনিক শাস্ত্রের নাম বিজ্ঞান। বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়-কুমার প্রথম বৈজ্ঞানিক। সমাজ জাতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানও এই প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষণেরই অঙ্গ। অক্ষয়কুমারের প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' এই জিজ্ঞাসারই অন্যতম চরিতার্থতা।

[3] James McCosh LLD., D.D., *The Scottish Philosophy*, London 1875, Article I. pp. 2-6.

[4] Bankim Chandra Chatterji, *English Works*, The Confessions of a young Bengal, p. 66.

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে তিনি একাধিক উপন্যাস লিখেছিলেন, কিন্তু কোনো প্রকাশিত প্রবন্ধের সংবাদ আমাদের জানা নেই। সুতরাং তাঁর মনীষার সূচনা এবং ক্রম-প্রোঢ়ত্বের ইতিহাস আমরা জানি না। কিন্তু বঙ্গদর্শনেই 'ভারতকলঙ্ক' (বৈশাখ, ১২৭৯) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা (ভাদ্র ১২৮০) বঙ্গদেশের কৃষক (ভাদ্র, কার্তিক, ফাল্গুন, পৌষ ১২৭৯) সাম্য (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, কার্তিক ১২৮০), উত্তরচরিত (জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন ১২৭৯) প্রভৃতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধরচনাশক্তি এবং চিন্তার পূর্ণ পরিণতি রূপ দেখে বিস্মিত হতে হয়। বঙ্কিমের স্বৈরথ চালনায় কল্পনা এবং মননের স্বয়ংসম্পূর্ণতাই বিশেষ অবধানযোগ্য। মননচেতনাকে কল্পনাবৃত্তি কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করেনি। আবার কল্পনাবৃত্তিও মননচেতনার দ্বারা বিদ্ধমাত্র প্রভাবিত হয়নি। বস্তুত একথা বললে অত্যুক্তি হবে না, লেখক যে একজন কবি বা ঔপন্যাসিক, তাঁর প্রবন্ধ থেকে তার সামান্যতম আভাস পাওয়া যায় না। বঙ্কিমের সব কিছু সৃষ্টির পিছনে একটি ব্যক্তিই আছে সত্য, কিন্তু কবিত্ব এবং মনীষা আশ্চর্যভাবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। জীবনকে অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করা এবং তাকে মননের দ্বারা বোঝা—দুই ক্ষমতাই তিনি অর্জন করেছিলেন। তবু তিনি সর্বদাই একটা সীমা মেনে চলেছেন। বঙ্কিমের রচনায় প্রবন্ধের গৌরব অসামান্য। কবিত্বের অনুমোদন সংগ্রহ করে প্রবন্ধকে পাঠকগ্রাহ্য হতে হয়নি।

বঙ্কিমের প্রবন্ধ রচনার দুটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তাঁর মনীষাদৃষ্টি এবং আলোচনা-পদ্ধতি পরের পর্যায় থেকে ভিন্ন। প্রথম দিকে তিনি লিখেছেন খণ্ড প্রবন্ধ, দ্বিতীয় পর্যায়ে 'ধর্মতত্ত্ব' 'কৃষ্ণচরিত্র' গীতার ব্যাখ্যা প্রভৃতি বড়ো বই। প্রথম দিকের প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত শেষের দিকের চেয়ে আলাদা। উপন্যাসেও দেখা যায় প্রথম যুগে তিনি যতখানি তত্ত্বচিন্তাবর্জিত হয়ে আর্ট চর্চা করছিলেন, পরে আর ততখানি নিরঙ্কুশ ছিলেন না। বোধহয় এরকম উক্তি করা যেতে পারে বঙ্কিম-মনীষার প্রথম যুগে যুক্তির চর্চার সঙ্গে ব্যক্তি-আদর্শের অতিরেক এসে যুক্ত হয়নি। ত্রিশ বৎসর আগেও নব্যবঙ্গের আলোচনাপদ্ধতিতে যে যুক্তিবাদের প্রবর্তন হয়েছিল, তিনি তারই ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। এই সব প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য একাধিক দিয়ে অনুধাবনযোগ্য। এদের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস থেকে তথ্যপ্রমাণ এবং কার্যকারণের যোগাযোগ উদ্ধার করে স্বদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে তিনি রূপ দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি মহাপুরুষ-বচনকে কোথাও প্রামাণ্য করেননি। জীবনে বা জগতে যা ঘটছে, তার বাইরে আর কিছু বিচার্য নেই। সেই ঘটনাও প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। ইতিহাসে আমরা যা পাই তাকে এক অর্থে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যই বলতে পারি। নব্যবঙ্গেরা এই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের বাইরে এক পাও অগ্রসর হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রও কোনো তত্ত্বের আকর্ষণে তথ্যভ্রষ্ট হননি। নব্যবঙ্গের যুক্তিবাদিতার সঙ্গে তাঁর যোগ কত নিবিড় ছিল উল্লিখিত রচনাগুলিই তার প্রমাণ। রাজনারায়ণ বসু 'সেকাল ও একাল' বইতে বাঙ্গালীর অনু-করণপ্রিয়তার নিন্দা করেছিলেন। তারই সমালোচনায় বঙ্কিম লিখেছিলেন 'অনুকরণ' প্রবন্ধটি (১২৮১)। এতে তিনি অনুকরণকে প্রয়োজনীয় বলেই সমর্থন করেছিলেন। অবনত জাতিকে উন্নততর সভ্যতার অনুকরণ করতেই হয়। তা না হলে উন্নতির সম্ভাবনা নেই। বাঙ্গালী পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় হীন অতএব অনুকরণই সেই যুগের স্বাভাবিক এবং আশাপ্রদ লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মতবাদ রচনা করতে সম্পূর্ণই য়ুরোপীয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করেছেন। নব্যবঙ্গেরা ভারতীয় আদর্শ এবং মূল্যবোধে আস্থা হারিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে সভ্যতার মান আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছিল। এর মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম বিতর্কের অবকাশ আছে। অন্ধ অনুকরণ অবাঞ্ছনীয় সন্দেহ নেই; কিন্তু সে যুগে অত সূক্ষ্ম বিচারের অবকাশ কোথায়। পঞ্চম দশকে দেবেন্দ্রনাথ এর

একটা সীমা নির্ধারণের চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে উন্মাদনা হ্রাস পেলে নব্যবঙ্গের আতিশয্যকে বঙ্কিমচন্দ্রই সমালোচনা করেছিলেন। ইতিহাস-চেতনা যুক্তিবাদ এবং সমাজ-কল্যাণ-চিন্তার আর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি। বাংলা দেশ এবং ভারতবর্ষের কৃষকদের অবস্থা পর্যালোচনা—নবীন মনস্বীদের বিশেষত প্যারীচাঁদ মিত্রের উৎসাহ ছিল। জ্ঞানোপার্জিকা সভায় এই বিষয়ে প্রবন্ধ পড়া হয়েছিল পরে ক্যালকাটা রিভিউতে[৫] The Zemindar and the Ryot নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধে তিনি বিভিন্ন শাসনকালে কৃষকদের অবস্থার বিবরণ দেন। বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র এই বিষয়েই একটি বই লেখেন Bengal Ryots (১৮৬৪)। এই সঙ্গে অবশ্য রমেশচন্দ্রের The Peasantery of Bengal-ও (১৮৭৪) স্মরণীয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার ও রায়তের মধ্যে যে সম্পর্কের পরিবর্তন এল, তাতে অনেক সমস্যাই দেখা দিল। বঙ্কিম এর আনুপূর্বিক ইতিহাস নিষ্ঠার সঙ্গেই দিয়েছেন কিন্তু কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন 'কৃষকের এত বড় দুঃখের প্রতিকার কিসে সে সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলতে পারেন নি। সে সম্বন্ধে অবতারণা করেছেন বহু ব্যাপার—দশ শালা বন্দোবস্ত এর জন্য খুব বেশি দায়ী সে কথাও বলেছেন, কিন্তু জমিদারি চাই না এমন প্রস্তাবের সম্মুখীন হতে চাননি, চাওয়া অন্যায় মনে করেছেন।'৬ বঙ্কিম জমিদারদের কঠোর সমালোচনা করেছেন; করেও জমিদারীর অবসান চাননি—এতে মনীষার ত্রুটি কিছুই প্রমাণিত হয় না। কারণ জমিদারীর অবসানে যে সমাধান, সে তখনও অনিবার্য বলে মনে হয় নি। ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক এবং নৈতিক যুক্তি বঙ্কিম ঠিকই স্থাপন করেছিলেন এবং এই যুক্তি স্থাপনাতেই তাঁর তীক্ষ্ণ মনীষার পরিচয়। যে সমাধান বিংশ শতাব্দীর সে যুগে যদি সেই সমাধানের সঙ্কেত না এসে থাকে তবে সেইজন্য তাকে প্রতিভার পরাজয় বলা যায় না।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'ভারতকলঙ্ক' এবং 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' প্রবন্ধ দুটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ টমসন এদেশে এসে রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাত করেন। অবশ্য টমসন বিদ্রোহ চান নি বরং ইংরেজ প্রভুত্বের উপর আস্থা রাখতেই তিনি প্রেরণা দিয়েছিলেন। এঁরই উৎসাহে স্বদেশের অতীত এবং বর্তমানের আলোচনা নেহাৎ গ্রন্থগত না থেকে জীবন্ত হয়ে দাঁড়াল। ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া এই নিয়ে মন্তব্য করেছিল এবং রিচার্ডসন একবার দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতায় রুদ্ধ হয়ে সভা ছেড়ে গিয়েছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং রামগোপাল ঘোষ এই রাজনৈতিক জাগরণের নেতৃত্ব করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ (এবং প্রায় সেই সময়ের নীল বিদ্রোহ) সমস্ত দেশে রাজনৈতিক ক্রিয়ার তরঙ্গ তুলল, বাঙ্গালী তাতে ইংরেজের পক্ষে থাকলেও এই চেতনার ঐতিহাসিক এবং তাত্ত্বিক দিকটা যাদের বিশেষভাবে আবিষ্ট করেছিল বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাদেরই অন্যতম হয়তো প্রধানতম। নব প্রকাশিত বঙ্গদর্শনেই বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবাসীর স্বাধীনতা আর তার শক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেন। তাতে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবণতা সব সময়েই ছিল নীতি নির্ধারণের দিকে; রাজনৈতিক চেতনারও একটা ঐতিহাসিক সূত্রই তিনি খুঁজেছিলেন।

এই শ্রেণীতে 'সাম্য'কেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। 'সাম্য'র মূল প্রেরণা ইংরেজ শাসনের পরোক্ষ প্রভাব থেকেই এসেছিল। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের সনাতন ভেদকে প্রথম অস্বীকার করল ইংরেজ আইন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি থেকেই এর সূচনা। বিচারের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হল। আরও পরের যুগে মানবীয়তার আদর্শ যখন নতুন শিক্ষার সহায়তায় দেশে ছড়িয়ে

[5] *The Calcutta Review*, 1846.

(৬) কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ', বিশ্বভারতী, ১৩৬৩, পৃ ১০২

পড়তে লাগল তখন তাকেই অবলম্বন করে ধীরে ধীরে ভাষা পেল সাম্যের অধিকারবোধ। মানুষের মর্যাদা আমাদের ভাবের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল। সহমরণ নিবারণে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে, বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টায়, জনশিক্ষার ক্রমপ্রসারে, কালা আইনের প্রবর্তনে, হিন্দু কলেজের রূপান্তরে—সমাজের সব দিকেই যেন অধিকার অর্জনের উদ্যম। রাজনৈতিক আন্দোলনও এর একটা দিক। যদিও সাম্যের অর্থনৈতিক তাৎপর্য তখনও খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি কিন্তু বঙ্কিম-মনীষার ঐতিহাসিক কারণেই এর আভাস এসে গিয়েছিল। দেশের কৃষকদের অবস্থা পর্যালোচনা করতেই এর সূচনা। রেণেসাঁর সময়ে যে মানবতাবোধের উন্মেষ ফরাসী বিপ্লবে তার অগ্রগতি। বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের এই মানবতাকে কতকগুলি স্পষ্ট তাৎপর্যের সূত্রে ছক কেটে দিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায়, অধ্যাত্মক্ষেত্রে, সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কে সাম্যের আদর্শকে খুব ঋজুভাবে উপস্থাপিত করলেন। বঙ্কিমের সাম্যতত্ত্ব শুধু পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ব্যাখ্যা নয়, আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে অসাধারণ ধী শক্তি সহকারে তিনি যুগচেতনার একটি শাশ্বত রচনা করেছিলেন বলা যায়। 'সামাজিক প্রবন্ধে' মনীষী ভূদেবও সাম্যের আদর্শ আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের জাগ্রত নবীন মনের ঔৎসুক্যের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। বঙ্কিম সাম্যতত্ত্বের ইতিহাস এবং যুক্তি সংগ্রহ করেছিলেন য়ুরোপ থেকে। এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা স্বভাবত জাতিনিরপেক্ষ নির্বিশেষ। আমাদের সমাজেও বঙ্কিম এর প্রযোজ্যতা কল্পনা করেছিলেন। সাম্যের যে যে পরিচ্ছেদে আমাদের দেশের কৃষকদের অবস্থা পর্যালোচনা আছে, সেই পরিচ্ছেদগুলি 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করে সাম্য বইটি তিনি আর মুদ্রিত করেন নি। তিনি শ্রীশ মজুমদারকে বলেছিলেন "সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।"[৭] বঙ্কিম-মনীষার এটি দ্বিতীয় পর্যায়। সেই সময় মিলের প্রভাব বঙ্কিমের উপর থেকে কমে গিয়েছে। সমাজ ও দেশের অতীত নির্বিশেষ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে দেশীয় সংস্কৃতি এবং অধিকার ভেদ তত্ত্বে বিশ্বাস এসেছে। কিন্তু সাম্যের শেষ পরিচ্ছেদে তিনি বলেছিলেন 'শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়'। এই বিশ্বাসটি তাঁর শেষ পর্যন্ত ছিল। তবে শিক্ষার প্রকৃতি হয় তো কিছু পরিবর্তিত হয়েছিল।

বঙ্কিম-মনীষার প্রথম পর্যায়ে যে কঠোর ইতিহাস-নির্ভরতার লক্ষণ আছে, সেটা খাঁটি অতীত রচনার দিকেও সার্থকতা খুঁজেছিল। বাংলা দেশের ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এবং এই ঔৎসুক্য পরেও জাগ্রত ছিল। প্রথম যুগে ভারতবর্ষের জাতীয় প্রকৃতির সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের অতীতের দিকেও চোখ ফিরিয়েছেন আবার পরবর্তী কালেও ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা করতে গিয়েও বাংলার সম্বন্ধে অনুসন্ধান-স্পৃহা অক্ষুণ্ণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধীয় মতামতের পূর্ণ রূপও বঙ্গদর্শনের আরম্ভ থেকেই গড়ে উঠতে থাকে। উত্তর-চরিতের সমালোচনায় আমাদের দেশে তিনিই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন।[৮] যে জীবন-পিপাসা বঙ্কিমের সব সৃষ্টির মূলে সাহিত্যতত্ত্বেও তিনি সেই মানবজীবনকেই খুঁজেছেন।

(৭) বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পৃঃ ১৯৮

(৮) বঙ্গ দর্শনের একজন প্রসিদ্ধ লেখক একদিন ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুরাতন দলের চাইকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে কেন?"

উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন "পুরাতন মন্দিরগুলিকে নাড়াচাড়া করা উচিত নয় কি?" লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন?' বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন "নাড়াচাড়া করিতে করিতে ঐ মন্দিরগুলি ভাঙিয়া পড়িবে, উহার স্থানে নূতন মন্দির উঠিবে।" —বঙ্কিম প্রসঙ্গ পৃঃ ৫৯-৬০

তিনিই প্রথম সাহিত্যকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করলেন। আমাদের রুচিকেও বঙ্কিম কবিকঙ্কণ মনসা-মঙ্গলের অন্ধকোণ থেকে বিশ্বসাহিত্যের পথে চালিত করলেন।

বঙ্গদর্শনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মনন-সাধনার একটা যুগ শেষ হল। বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকায় আধুনিক কালের স্বাধীন মননের যে উন্মেষ দেখি, বঙ্গদর্শনে তারই অনুবৃত্তি। বঙ্গদর্শন বঙ্কিমের সম্পাদনায় চার বছর চলে বন্ধ হয়ে গেল। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় অনিয়মিতভাবে কিছুদিন চলে আবার বন্ধ হল। তারপর প্রচার পত্রিকার প্রকাশ হল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে; নবজীবনও সেই বৎসরে বেরিয়েছিল। এই সময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। উল্লেখযোগ্য এই যে নব্যবঙ্গেরা তাঁদের আলোচ্য বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে ধর্ম্মকে স্বীকার করে নি। ডিরোজিওর বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগই ছিল—তিনি ছাত্রদের নাস্তিকবাদে দীক্ষিত করছেন। নৈতিক আদর্শ অসামান্য হলেও ডিরোজিওর ছাত্রেরা ধর্ম্মভাবনায় প্রবৃত্ত ছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ততটা উৎসুক ছিলেন না, পরে এই দিকেই তাঁর বিশেষ কৌতূহল দেখা গেল। এই নূতন উৎসাহের মূলে ছিল সেই একই জিজ্ঞাসা যা তাঁর প্রথম দিকের প্রবন্ধের মূলে ছিল। অর্থাৎ সেই জীবন বা অস্তিত্বকে বোঝবার আকাঙ্ক্ষা। প্রথমে তিনি ইতিহাস অর্থনীতি এবং সমাজনীতির ফরমুলা দিয়ে এই জীবনকে জানতে গিয়েছেন। কিন্তু সে জানায় শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি আসে নি। কারণ এতে জীবনের বহিরঙ্গ-গঠন যত জানা যায়, অন্তরঙ্গ-রহস্য যেন তাতে ঠিক সেরকম জানা যায় না। ধর্ম্মতত্ত্বে তিনি নিজের অন্তর্জীবনের ইতিহাস দিয়েছেন। তাতে বলেছেন "অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি।"[২] সুতরাং জীবনের রহস্য-সন্ধানের ইচ্ছা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্বেরই বৈশিষ্ট্য নয়। প্রথম থেকেই তিনি এই প্রেরণায় চালিত হয়েছিলেন। মননের দিক থেকে এটা অগ্রগমন না পশ্চাদ্‌গমন সেটা এই মূল প্রশ্ন থেকেই নির্ণয় করে নেওয়া দরকার।

বঙ্কিম যে সময় ধর্ম্মালোচনা করছিলেন, সে সময় দেশে পৌরাণিক এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনর্জাগরণ হয়েছিল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পরবর্তী ইতিহাসও রচিত হচ্ছিল সেই সময়। কেশবচন্দ্র ইতিপূর্বেই দেবেন্দ্রনাথের সম্প্রদায় থেকে সরে এসেছিলেন। অতঃপর কেশবচন্দ্র যখন ভক্তিভাবের প্রাধান্য দিলেন তখন তাঁর থেকেও শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে নতুন একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠল। কেশবচন্দ্র বঙ্কিমের সমবয়সী। প্রেসিডেন্সী কলেজে দুজনে এক সঙ্গে পড়তেন। কেশবচন্দ্র অসাধারণ বক্তৃতাশক্তির জন্য আগেই বিখ্যাত হয়ে পড়েন। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের আগেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন "I wish to know how far you have outgone me."(১০) কেশবের প্রতি বঙ্কিমের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। ধর্ম্মতত্ত্বে কেশবচন্দ্রকে বঙ্কিম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক অন্য হিন্দু নেতাদের সম্পর্কেও এমন সশ্রদ্ধ উল্লেখ তিনি করেননি। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি সেই সময় কলকাতায় হিন্দু ধর্ম্মের অভিনব ব্যাখ্যা করছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রই কৌতূহলী হয়ে প্রথম তাঁর সভাতে সভাপতিত্বও করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে তর্কচূড়ামণির দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হননি এমন কি এঁর সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ করেছিলেন তার একাধিক প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্র অধ্যায়ে লিখেছেন

'এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিমবাবুর মুখেই

(৯) ধর্ম্মতত্ত্ব, একাদশ অধ্যায় (১০) বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পৃঃ ২৩৭

তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন।.....কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার 'প্রচার' পত্রে তিনি যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।' পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র ও শশধরের সম্পর্কের পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। বঙ্কিমকে প্রচার এবং নবজীবনে ধর্ম্মব্যাখ্যায় নিরত দেখে চূড়ামণি তাঁর সাহায্য চেয়েছিলেন। আলবার্ট হলে বঙ্কিমের সভাপতিত্বে চূড়ামণি বক্তৃতা দিলেন। দু একদিন পর বঙ্কিম আর গেলেন না। তিনি বললেন, 'কয়দিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। .....তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানাসূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম চায়। কি হইলে এ দেশের সমাজধর্ম্ম এখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নাই, তাই যা খুসি তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।'[১১] বঙ্কিমচন্দ্র নিজে প্রকাশ্যে তর্কচূড়ামণির মত অগ্রাহ্য করেছিলেন।[১২] শশধর তর্কচূড়ামণির আন্দোলন স্থায়ী হয় নি। কিন্তু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধর্ম্মান্দোলন দেশে স্থায়ী প্রভাব রেখে গিয়েছে। এই আন্দোলনকে বঙ্কিমচন্দ্র কি চোখে দেখেছেন, এবিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে পরমহংসদেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে ধারণা করা শক্ত। তবে বঙ্কিমের দৃঢ় বাস্তববোধের পরিচয় সেখানেও পাওয়া যায়।[১৩] চিকাগো থেকে বিবেকানন্দ ফিরে এলে দেশে যে অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাতে যোগ দেন নি বরং বিশেষ কৌতূহলের বিষয় হচ্ছে

"একদিন বঙ্কিমবাবুর বাসায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি, পথিমধ্যে একজন একখানি হ্যাণ্ডবিল আমার হস্তে অর্পণ করিল। তাহাতে শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সিকাগো মহামেলা হইতে প্রত্যাগমন উপলক্ষে হাবড়ার রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে সম্মাননা ও অভ্যর্থনার জন্য বহুসংখ্যক লোকের সমাগম উদ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি সেখানি বঙ্কিমবাবুকে দেখিতে দিলাম। বঙ্কিমবাবু তাঁহার অভ্যর্থনার্থ যথাসময়ে তথায় যাইবার জন্য সমুৎসুক হইলেন।"[১৪]

আশা করি এর থেকে বুঝতে পারা যাবে বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক ধর্ম্মান্দোলনে কতখানি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেছিলেন। বরং ব্রাহ্ম নেতাদের সম্বন্ধেই তিনি সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কিংবা শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে তাঁর অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। বিপিনচন্দ্র পালের এই উক্তি 'বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্ব ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই নামান্তর' কথাটা এই দিক দিয়েও বিবেচ্য। সমসাময়িক হিন্দু ধর্ম্মান্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ দেখা যায় না দেখে বিস্মিতই হতে হয়। বঙ্কিমের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' বা 'কৃষ্ণচরিত্র' থেকে মনে হয় তিনি বুদ্ধি রক্ষণশীল হিন্দু ধর্ম্মের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার বঙ্কিমচন্দ্র কোনো সম্প্রদায় স্থাপন করেননি। অন্য সব আন্দোলনই সম্প্রদায় স্থাপনে উৎসুক ছিল। বঙ্কিমের ধর্ম্মালোচনায় সে রকম কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না। তাঁর 'ধর্ম্মতত্ত্ব, 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং গীতার অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পড়লে বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্ম্ম বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা আসলে হিন্দুধর্ম্ম নয়, তাকে বলা যায় মানবধর্ম্ম। মানুষের সবগুলি বৃত্তির সমঞ্জস বিকাশ এই ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট যদিও লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর। বঙ্কিমচন্দ্র এই চিন্তা কেশবচন্দ্রের থেকে পেয়েছিলেন বলে কেউ কেউ মনে

(১১) বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃঃ ৯২ (১২) বঙ্কিম গ্রন্থাবলী বিবিধ, সাহিত্য পরিষৎ, পৃঃ ১৮৭, পাদটীকা (১৩) পরমহংসদেবের উক্তি 'তুমি যা খাও তাই ওগরাচ্ছ'। (১৪) বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃঃ ২৩৫। কালীনাথ দত্তের বিবরণ।

করেছেন। এই বিষয়ে যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা কিন্তু অন্যরকম—"বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাহিত্যের বিশেষতঃ ধর্ম সাহিত্যের কোনও ধারই ধারিতেন না, এবং কোনও সংবাদই লইতেন না। ইহা তাঁহার ন্যায় একজন ধর্মনেতা ও বঙ্গসাহিত্য-পোতের কর্ণধারের পক্ষে বড়ই শোচনীয় অভাব।"[২৭] বঙ্কিমের আলোচনায় ভাবাবেগের কোনো স্থান ছিল না। কেশবচন্দ্রের মতো বাগ্মী এবং সাধকের সঙ্গে এখানেই বঙ্কিমের সবচেয়ে বড়ো বৈসাদৃশ্য। সম্ভবত এইজনাই বঙ্কিমের অনুবর্তী নেই। যে ধর্মচিন্তায় অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির স্থান নেই, আবেগ এবং উচ্ছ্বাস নেই তার কোনো সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে না—বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইতিহাসজ্ঞ মনীষীর এই তথ্য অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। মনীষার দ্বিতীয় যুগেও তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথও এর উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনায় "আমাদের মতে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি। প্রথমত বঙ্কিম বুঝাইয়াছেন, জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনুবর্তী হইয়া আমরা পূজা করিব না, সতর্কতার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্তী হইয়া পূজা করিব। তাহার পরে দেখাইয়াছেন, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র।"

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচিন্তায় কোথাও বিন্দুমাত্র অলৌকিকতার স্থান নেই। ধর্ম বস্তুটাকে তিনি মানুষের একেবারে স্থূলতম দৈহিক ভাবনার উপর স্থাপন করে জিজ্ঞাসাকে ক্রমেই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করে তুলেছেন। বঙ্কিমের চিন্তাপদ্ধতিকে এদিক থেকে বলা যায় জ্যামিতিক। দৈহিক বৃত্তিগুলি স্বতঃসিদ্ধ—এর থেকে বঙ্কিম নতুন সিদ্ধান্তগুলি কষে বের করে নিয়েছেন। ধর্মতত্ত্বে এই নিয়মেই ব্যক্তির সুখ-দুঃখবোধ থেকে আলোচনা আরম্ভ করে সমাজ দেশ বিশ্ব পর্যন্ত একটি সুসংগত ছকের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। সবার উপরে অবশ্য ঈশ্বরের কল্পনা করেছেন কিন্তু বঙ্কিমের মতো যুক্তিবাদীর কাছে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া ছাড়া ঈশ্বরপ্রীতির অন্য মূল্য নেই। বঙ্কিমের এই পদ্ধতি স্কলাসটিক পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্কিমের ধর্মভাবনা আত্মপ্রীতির স্বতঃসিদ্ধ পশুপ্রবৃত্তি থেকে সুরু হয়েছে বলে যেমন হব্‌স্‌এর দর্শন তাঁকে প্রভাবিত করে থাকবে বলে মনে হয় তেমনি আত্মপ্রীতির মানদণ্ড দিয়ে সমাজ রক্ষার মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ইউটিলিটারিয়ানদের সঙ্গে তাঁর মিল খুব চোখে পড়ে। এক কথায় বঙ্কিম আধ্যাত্মবাদীদের দিকে না ঝুঁকে প্রয়োজনবাদী দার্শনিকদের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বুদ্ধির চর্চা বঙ্কিমের মধ্যে জীবনের গাণিতিক ব্যাখ্যার মহিমায় আকৃষ্ট করেছিল। গীতার ভূমিকাতে বঙ্কিম বলেছেন,

"এখন গোলযোগের কথা এই যে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারেন না। ইহা উঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তাপ্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হয় না। ....তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।"

ধর্ম আর কোনো নির্জন উপলব্ধির বিষয় থাকল না। ধর্মের দুই দিক—বৈরাগ্যসাধন মুক্তিচর্চা এবং লৌকিক দেবার্চনা—পূর্বপ্রচলিত কোনো আদর্শই বঙ্কিম-কল্পিত ধর্মে স্থান পায় নি।

(১৫) বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃঃ ২৩৪; কালীনাথ দত্তের বিবরণ।

তত্ত্বের মধ্যে সমাজসেবা এবং দেশপ্রেমকে, এক কথায় জীবনের দায় দায়িত্বকে যে অবশ্যকর্তব্য বলে নির্দেশ করেছেন, তাতেই বোঝা যায় বঙ্কিমের ধর্ম বাস্তব জীবন ধারণের মধ্যেই নিহিত। আসলে মনে হয়, বঙ্কিমের মনীষায় ধর্মের সংজ্ঞাই ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ঐহিক জীবনকে পূর্ণাঙ্গ কল্পনা করতে গিয়ে যে উপায় স্থিরীকৃত হয়েছিল, তারই নাম অনুশীলন তত্ত্ব। বঙ্কিম বুদ্ধ বা চৈতন্যের মতো ধর্মপ্রবক্তা ছিলেন না। সীলির যে উক্তি তিনি ব্যবহার করেছেন The substance of Religion is Culture— তাঁর ধর্ম কল্পনাতে সেই বক্তব্যকে কিছু ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন। 'কালচার' অর্থ অনুশীলন এবং অনুশীলন দেহধর্মেরই।

বঙ্কিম বলেছেন 'সুসমঞ্জস অনুশীলন'। এই শব্দটির মধ্যে নৈতিক ইঙ্গিত আছে। যে আচারবদ্ধ হিন্দুধর্ম মধ্যযুগে নৈতিক মূল্যবোধকে হারিয়েছিল, মানবতার প্রতি অবিশ্বাস, জীবনাচরণে স্বার্থসাধনের অন্ধতা দৈবী কল্পনাতে বিচারহীন হীনতার যে প্রাধান্য ঘটেছিল, রামমোহনের নেতৃত্বে নতুন মার্জিত উচ্চ ধর্মচিন্তার সূচনা হল তারই থেকে। আধুনিক যুগে নব্যবঙ্গেরা মর‍্যালিটিকে এতখানি প্রাধান্য দিয়েছিল তার মর্মে অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের শৈথিল্য থাকলেও বাস্তব জীবনের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ধ্বনিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর তথাকথিত নব্যবঙ্গের অন্যতম ছিলেন না বটে, কিন্তু যুগচিন্তায় তিনি প্রবুদ্ধ ছিলেন। তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার মূলে মানবতার মহত্তর নীতির প্রেরণা ছিল। এই নীতিটিই মধ্যযুগে অস্বীকৃত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ এক ধরণের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির প্রেরণা লাভ করলেও এই নীতিবোধকে তারই মহিমারূপে বরণ করেছিলেন। বঙ্কিম 'প্রচার' পত্রিকায় ধর্মালোচনার সূচনা করলেন; তখনই বঙ্কিমের আদর্শের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট আদর্শের দ্বন্দ্ব বেধে গেল। বঙ্কিমের সত্যধারণা যে বাস্তব নীতিবোধের দ্বারাই গঠিত, তাঁর দেওয়া দৃষ্টান্তই সে কথা প্রমাণিত করে। রবীন্দ্রনাথ সত্যের একটা নির্বিশেষ রূপ কল্পনা করেছিলেন। সত্যের একটা ব্যবহারিক দিক আছে দার্শনিক দিক ছাড়াও। বঙ্কিম সত্যকে জীবনের ক্ষেত্রেই দেখতে চেয়েছিলেন।

বঙ্কিম বলেছিলেন জগতে হিন্দু ধর্মই শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য এই ধর্ম বঙ্কিম-ব্যাখ্যাত হিন্দু ধর্ম। তিনি কছিখাদী সেখকে দিয়ে দুর্গাপূজা করাবার সংকল্প করেছিলেন এবং হিন্দু ধর্মের বথামিগুলি মানতে চাননি।[১৭] এই ধর্মের সঙ্গে সনাতন হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য তত ব্যাপক নয়। কারণ বঙ্কিমের কাছে ধর্মের পুরনো অর্থ আর সত্য নয়। যে মানুষ পাঠশালায় যায়, বিবাহ করে, জীবিকা অর্জন করে সন্তান পালন করে, সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করে এবং মরে—বঙ্কিম তাদের জীবনাচরণের আদর্শ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমের প্রখর মনস্বিতার লক্ষণ এই যে হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ থেকেই তিনি অনুশীলন ধর্মের কল্পনা করেন নি বরং অনুশীলন ধর্মের রূপ কল্পনা করে নিয়ে হিন্দু বা ভারতীয় জীবনে তার সমর্থন খুঁজেছিলেন। সেইজন্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় যুক্তি এবং সিদ্ধান্তের পরে শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত তিনি উদ্ধৃত করেছেন, শাস্ত্রের বচন দিয়ে যুক্তিকে তিনি তৈরী করেননি। মূলত তিনি যে 'ইণ্টেলেকচুয়াল' তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য বঙ্কিম য়ুরোপীয় পাণ্ডিত্য এবং সভ্যতার প্রতি কখনো কখনো কটাক্ষ করেছেন। ধর্মতত্ত্বে পাশ্চাত্য যন্ত্র সভ্যতার দানবীয় আত্মপ্রকাশের কথাও উল্লেখ করেছেন (১৮) আবার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কাছে ঋণ স্বীকার করতেও তিনি ভোলেন নি। পাশ্চাত্যের কাছে বিজ্ঞান শিখবার নির্দেশ বহু স্থলেই দিয়েছেন।

(১৬) গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি, 'পূজাবাড়ীর ভিক্ষা'।

(১৭) ধর্মতত্ত্ব, সপ্তম অধ্যায়

(১৮) ধর্মতত্ত্ব সপ্তম অধ্যায়

সে যুগের একজন প্রতিনিধিরূপ চিন্তানায়ক হিসাবে সভ্যতার মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়নী রূপের একটা মিলনই তিনি চেয়েছিলেন।

তবু শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম-মনীষার মূল্য বিচার করতে গিয়ে দুটি প্রশ্ন আসে। তিনি তাঁর দর্শনে মূলত হিন্দু ঐতিহ্য থেকেই সমর্থন খুঁজেছিলেন, পূর্বযুগের ইংরেজি শিক্ষিতরা তা করে নি। অন্ধতামুক্ত হওয়ার যে উদ্যম আমাদের নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ঐতিহ্যপ্রীতি দ্বারা তা খণ্ডিত হয়েছিল কি? বঙ্কিমচন্দ্র একটা দেশ এবং সমাজের মধ্যে থেকেই চিন্তা করেছিলেন। তিনি যাদের জন্য লিখছিলেন তাদের একটা ধর্ম এবং সমাজ আছে। সেই ধর্ম এবং সমাজের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বঙ্কিম মনে করেছিলেন আধুনিক চিন্তা দেশের যত গভীরেই প্রবেশ করুক সমাজহীন সে হবে না অথচ এই দেশ এবং সমাজের মধ্যেই নতুন চেতনার সঞ্চার করা দরকার। জাতি-সংস্কার একেবারে যায় না। সেক্ষেত্রে সেই সংস্কারকে অবহেলা করার মতো অবাস্তব বুদ্ধির পরিচয় না দিয়ে তারই একটা উদার যুক্তিসিদ্ধ মুক্তরূপের কল্পনা করাই প্রয়োজন। এ কথা তো সত্য যে অন্তরে যত নবীন উজ্জীবন-দৃষ্টিই আসুক না কেন এই সংস্কার আমাদের একেবারে ত্যাগ করে নি। যে সব আচার অনুষ্ঠান এখন নিরর্থক হয়ে পড়েছে তার জায়গায় অর্জিত হয়েছে আধুনিক যুগের নতুন মহৎ সংস্কার।

আর একটা প্রশ্ন থেকে যায়, ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম আদর্শ জীবনই কল্পনা করেছেন, কৃষ্ণচরিত্র বা দেবী চৌধুরাণীতে তিনি তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন—এদের মধ্যে প্রখর তর্কবুদ্ধি থাকলেও সে কি শেষ পর্যন্ত সম্ভব। আলোচনা অনেকটাই থিয়োরোটিক্যাল নয় কি? উচ্চতর গণিত যেমন যুক্তির পারম্পর্যে গাথা, বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্বও তেমনি। আবার গণিত যেমন যুক্তিসঙ্গত হয়েও abstract বঙ্কিমের আলোচনাও তেমনি যুক্তিসঙ্গত কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অব্যবহার্য। বঙ্কিম এটা জানতেন। আদর্শ সামঞ্জস্য স্থাপন কখনই সম্ভব নয়। আবার সব আইডিয়ালিস্টদের মতোই তিনিও আদর্শের অব্যর্থতায় বিশ্বাস করতেন। অসম্ভব হলেও তাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টাতেই মনুষ্যত্বের সাধনা এবং বিকাশ। বস্তুত তাঁর সময়ে জাতীয়তায় ধর্মচেতনায় সাহিত্যে যে চাঞ্চল্য তিনি দেখেছিলেন তারই একটা পূর্ণতার জীবনদর্শন তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব তাঁর যুগের শাস্ত্র। জীবনকে স্বীকার করেই তাঁর মনীষার পূর্ণতা। এইখানেই তাঁর অভিনবত্ব, তাঁর মহত্ত্ব।

বিভেদ ও মৌলিকতা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধন ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। একথা দেশে-বিদেশে প্রচার করে আমরা আত্মশ্লাঘা অনুভব করি। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্য আমাদের এক-ঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা করে। বৈচিত্র্যহীন জীবন মশলাহীন ব্যঞ্জনের মতোই বিস্বাদ। কিন্তু বৈচিত্র্য আর বিভেদ এক নয়। বাংলা, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মাদ্রাজে শাড়ী পরবার বিভিন্ন ধরণকে বৈচিত্র্য বলা যায়; ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীন বংশজ, রাঢ়ী বারেন্দ্রের যে পার্থক্য তা বিভেদ, বৈচিত্র্য নয়। জাতীয় জীবনের অনেক বিভেদই বৈচিত্র্যের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে। বিভেদ ও বৈচিত্র্যের পার্থক্য সম্বন্ধে আমরা যে যথেষ্ট সচেতন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিভেদকে বৈচিত্র্যের শ্রেণীভুক্ত করে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি।

বিভেদ প্রধানতঃ দু' জাতের। এক, চিন্তা ও মানসিকতার; দুই, জীবনযাত্রার রীতিনীতির। জাতীয় জীবনে প্রথম শ্রেণীর বিভেদের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা গভীর হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্তরের ভাবনা ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য যতটা প্রকট অন্য কোনো দেশে তেমন আছে বলে জানি না। এর ফলে জাতীয় ঐক্যবিধান বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আমরা স্বাধীন হয়েছি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখনো 'এক জাতি এক প্রাণ' হতে পারিনি।

জাতির মন এক চিন্তাভাবনার সূত্রে গেঁথে দিতে পারে তার সৃষ্টিশীল সাহিত্য। সংস্কৃত সাহিত্য যতদিন ভারতের সর্বত্র প্রাণবন্ত ছিল ততদিন আমাদের মনের ঐক্য ছিল অটুট। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের ও হিন্দু দর্শনেরও ভাষা বলে এই ঐক্য ছিল গভীর। দৈনন্দিন জীবনে সংস্কৃতের চর্চা কমে আসবার পরও ধর্মের মারফৎ এই ঐক্য বজায় ছিল। ভারতের সকল অঞ্চলের হিন্দুকে একই শাস্ত্রগ্রন্থের সহায়তায় ধর্মচর্চা করতে হত। কলিকাতা, কাশী, পুরী, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি ভারতের সকল হিন্দুর নিকটই পবিত্র। ভারতের ঐক্যবিধায়ক হিসাবে ধর্মের নাম প্রথমেই করতে হয়।

সংস্কৃত ভাষা ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত হয়ে পড়ল। তখন সৃষ্টি হল আঞ্চলিক ভাষা। সমগ্র দেশে যোগাযোগ রক্ষা করবার মতো একটি ভাষা আর রইলো না। সকল অঞ্চলের মুষ্টিমেয় পুরোহিত ও পণ্ডিত প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতে লাগলেন। তবে দেশের বর্তমান জীবন আঞ্চলিক ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে খণ্ডিত হয়ে গেল।

এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অন্ততঃ ঐক্যবোধ ছিল। বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে মাদ্রাজের অধিবাসীদের যোগাযোগ ছিল না বটে, কিন্তু বাঙ্গালীরা পরস্পরকে বুঝত, একের সঙ্গে অন্যের হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল। এই ঐক্যানুভূতির মূলে ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। প্রাক-ইংরেজ যুগের বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু, অলঙ্কার, উপমা এবং রচনাশৈলী সকলের নিকট সুপরিচিত ছিল। রামায়ণ, মহাভারত পুরাণের কাহিনী, চাঁদসদাগর, ফুল্লরা ও ভাঁড়ু দত্ত জাতীয় ভাণ্ডারের সম্পত্তি; ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলের পরিচিত। নিরক্ষর ব্যক্তি চণ্ডীমণ্ডপের পাঠ শুনে অথবা যাত্রার আসরে অভিনয় দেখে সাহিত্যের উপভোগ সমান ভাবেই করতে পারত। সাহিত্যের আসরে সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর মন মিলিত হবার যে সুযোগ ছিল এখন তা নেই।

তারপরে এল ইংরেজ, এল তাদের ভাষা। ইংরেজী বইয়ের মধ্যে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা চমকে উঠলাম। একেবারে নতুন জ্ঞানের জগৎ, আমাদের পরিচিত জগতের সঙ্গে

যার মিল নাই। বর্তমান পৃথিবীতে জাতি হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে এ জ্ঞান অত্যাবশ্যক। কিন্তু প্রশ্ন উঠল, এই জ্ঞান গ্রহণ করব কিসের মাধ্যমে,—ইংরেজী, না বাংলার? কোনো কোনো ইংরেজ বললেন, তোমরা আমাদের বিদ্যা বাংলায় গ্রহণ করো; দেশের সকল লোক তো আর ইংরেজী শিখতে পারবে না!

কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি দরকার। প্রস্তুতির জন্য সময়। নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী অপেক্ষা করবে না। তাছাড়া ইংরেজী শিখলে সাহেবদের কৃপাদৃষ্টি পড়বে, চাকরি পাওয়া যাবে। ইংরেজদের মধ্যেও অনেকে এদের সমর্থন করলেন। সুতরাং শিক্ষার বাহন এবং দপ্তরের ভাষা হল ইংরেজী। অলক্ষ্যে দেশের মন দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। দেশ বিভাগের চেয়েও তা মারাত্মক। ভৌগোলিক বিভাগ মাত্র নয়, মনের বিভাগ। পাশাপাশি বাস করেও দূরে থাকা।

ইংরেজী ভাষার চাবি দিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী নতুন জগতে প্রবেশের অধিকার লাভ করল। বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য কত নতুন নতুন বিষয়ের জ্ঞান। এখন শুধু কাশীরাম, কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস নয়; হোমার, দান্তে, ভার্জিল, গ্যেটে, শেক্সপীয়ার, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ শেলী, কীটস্ এসে প্রবেশ করলেন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর গৃহে। ইংরেজী জানা নতুন বাঙ্গালী লেখকদের ভাব, ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গী এত অপরিচিত যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার রসাস্বাদন করা কঠিন হয়ে পড়ল। সাহিত্য ছিল বাঙ্গালীর সর্বজনীন মিলনক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে গেল। সাহিত্য রচিত হতে লাগল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের জন্য। যাদের পাশ্চাত্য জ্ঞানের পটভূমিকার সঙ্গে পরিচয় আছে নতুন বাংলা সাহিত্য তারাই উপভোগ করতে পারবে। সুতরাং দেশের লোক দুই দলে ভাগ হয়ে গেল ঃ একদল ইংরেজী জানে, আর একদল জানে না। যারা ইংরেজী জানে তারাই সমাজের শীর্ষস্থানে আছে, দেশ শাসন এবং সংস্কৃতি চর্চার দায়িত্বও এদের হাতে। অথচ সংখ্যায় এরা মুষ্টিমেয়।

শিক্ষার দ্রুত প্রসার হলে দুই দলের মধ্যে ব্যবধান এত তীব্র হতে পারত না। ইংরেজী গ্রহণের সিদ্ধান্তের সওয়া শ' বছর পরেও পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরের হার শতকরা চব্বিশ। এই চব্বিশ জনের মধ্যে অধিকাংশই শুধু মাতৃভাষায় নাম সই করতে পারে।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্পন্নায় গ্রাম ছেড়ে শহরে এল; চাকরি, লাভজনক ব্যবসা, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হল তাদের প্রাধান্য। ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বৃহত্তর সমাজ পুরনো ঐতিহ্য নিয়ে দূরে সরে গেল। বিদেশী সরকার নিজেদের আসন দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে সেই সমাজের চিরাগত সংস্কার দূর করবার জন্য হস্তক্ষেপ করেনি। সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতীয়দের উদ্যোগে ১৮৫৭ সালের পূর্বে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। কিন্তু সাত্তাস বিপ্লবের পরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কারমূলক কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। দেশের মঙ্গলকামী প্রগতিশীল সরকার নিশ্চয়ই শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ দিয়ে এবং আইনের সাহায্যে যুগের অনুপযোগী সংস্কার ও কুসংস্কার দূর করতে সচেষ্ট হত। ব্রিটিশ শাসনের প্রায় দুই শতাব্দী পরেও ইংরেজী অনভিজ্ঞ অংশের সামাজিক অগ্রগতি সামান্যই হয়েছে। প্রগতিশীল সরকারের হাতে শাসনের ভার থাকলে দেশের দুই দলের মধ্যে ব্যবধান এমন তীব্র হবার সুযোগ হত না।

শিক্ষা ও মানসিকতার এই বিভেদের ফলে জীবনযাত্রার রীতিনীতিতেও স্বাভাবিকরূপেই পার্থক্য দেখা দিয়েছে। পোষাকে, আহার্যে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, চিত্তবিনোদনের পদ্ধতিতে এই পার্থক্য সুস্পষ্ট। বাহিরের পার্থক্যটাই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং মনের উপর এর প্রভাব কম নয়। ইংলণ্ডের যে মজুর তার বাড়িতে চেয়ার-টেবিল; কোটিপতির বাড়িতেও চেয়ার-টেবিল। মজুরের

বাড়ীর আসবাব হয়ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর, তফাৎ শুধু এইখানে। কিন্তু আমাদের দেশে গ্রামের মজুরের বাড়ি আছে পিঁড়ি, চাটাই কিংবা মাদুর; আর মধ্যবিত্ত এবং আরো উপরের শ্রেণীর বাড়ি পাওয়া যাবে চেয়ার টেবিল। আসবাব শুধু গুণে ও দামের দিক থেকে পৃথক নয়। তাদের জাতই আলাদা। যে চাষী গামছা পরে ক্ষেতে চাষ করে শহরের বাবু তাকে কৃষি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে যান বিদেশী পোষাক পরে। চাষী ভয়ে সেলাম করে; তার মনে এ অনুভূতি জাগে না যে বাবু আমাদেরই একজন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে আমাদের শহরগুলি। শহর ও গ্রামের সঙ্গে যে প্রভেদ তাতে দুই দলের মধ্যে পার্থক্যের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে গেলেই বিভেদটা উপলব্ধি করা যেতে পারে। সেখানে উপার্জনের সুযোগ নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, রাস্তা নেই, রোগে সুচিকিৎসার আশা নেই। আর নেই আধুনিক সভ্যতার অপরিহার্য দ্রুত বিদ্যুৎ। য়ুরোপ আমেরিকায় গ্রাম ও শহরে এমন প্রভেদ নেই। উভয়ের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে শুধু মাত্রার পার্থক্য।

পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বেও গ্রামের প্রতি এতটা অনাদর ছিল না। গ্রাম তো দূরের কথা, কলকাতা ছাড়া অন্য ছোট শহরগুলিরও যেন অস্তিত্ব নেই। একদা বর্ধমান, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি শহর থেকে বাংলা সাহিত্যের অনেক উল্লেখযোগ্য বই ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হত। এখন প্রায় সব বই কলকাতা থেকে বের হয়। এর ফলে সাহিত্যে সমগ্র দেশের মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। স্থানীয় লেখক স্থানীয় জীবনের কথাই লিখবেন বলে আশা করা যেতে পারে। পূর্বে রাশিয়াতেও মস্কো প্রভৃতি দু'একটি বড় শহরে দেশের প্রকাশনাশিল্প কেন্দ্রীভূত ছিল। পাঁচশালা পরিকল্পনায় দেশের সকল অঞ্চলে পুস্তক প্রকাশের ব্যবসা ছড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাশিয়া তার সুফল পেয়েছে।

আফ্রিকান নিগ্রো কিংবা অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীর মতো আমাদের যদি প্রাচীন ঐতিহ্য না থাকত তাহলে ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞের মধ্যে বিরোধের প্রশ্ন এমন করে ওঠবার সম্ভাবনা থাকত না। নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার রিক্ত হলে অন্যের সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে বাধা আসে না। ইংরেজী জানে না বলে দেশের বৃহত্তর জনসমাজ সভ্যতাবর্জিত নয়। তারা এক মহৎ সভ্যতার উত্তরাধিকারী। সে সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য কিছু ম্লান হয়েছে, কুসংস্কার তাকে আচ্ছন্ন করেছে; তবু এখনো তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় লোক দেশের জনসাধারণকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু বেশী দূর তারা যেতে পারেনি; দেশের শতকরা নব্বই ভাগ লোক হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার বন্ধন দিয়ে এদের পশ্চাতে টেনে রেখেছে। পাশ্চাত্য প্রগতিবাদের আধুনিকতম মন্ত্র গ্রহণ করেও ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোটি কোটি স্বদেশবাসীর পশ্চাদাকর্ষণ উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারেনি। আর ইংরেজী যারা শেখেনি তাদের জীবনও পাশ্চাত্য সভ্যতার গৌণ প্রভাবে বহুল পরিমাণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সর্বত্রই প্রাচীন ও নবীনে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব।

যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই এই দ্বন্দ্বের ছবি। আমাদের আকাশে বিমান চলে; নীচে কর্দমাক্ত পথে চলছে হাজার হাজার গোরুর গাড়ী। অর্থবিদ্যায় এম-এ পাশ মহিলাকে অর্থসৌভাগ্য কামনা করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মীর পুজো করতে দেখি। অধুনাতম কোকাকোলার খবরের পাশে ছাপা হয় সাপ্তাহিক ভাগ্যফলের বিবরণ। সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে আমরা বিশ্বাসী; অথচ নিজের পুত্র-কন্যা বিয়ে দেবার সময় জাতি, কুল, বংশ, গোত্র কত কী বিচার করতে বসি! সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত গান্ধীজীর প্রতি আমাদের মনোভাব। আমাদের মধ্যে যে শাশ্বত ভারতীয় বাস করে তার প্রেরণায় গান্ধীজীকে আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য-মুখী মন রয়েছে তার আস্থা নেই গান্ধীজীর আদর্শে ও কর্মপন্থায়। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মিলন

ঘটেনি বলে এতবড় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রভাব জাতির জীবনে স্বল্পস্থায়ী হল। বুদ্ধদেবের অনুচরবর্গের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ছিল না। তাঁরা বুদ্ধদেবের আদর্শ ও সাধনায় পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন। মুণ্ডিতমস্তক, ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত বৌদ্ধ শ্রমণের দল দেশে-বিদেশে বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে যখন বেরিয়েছেন তখন তাঁরাও জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রচারকদের দেখে বুদ্ধের মহান ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যেত। কিন্তু গান্ধীজীর জীবনের সারল্য ও কৃচ্ছ্রতার আদর্শ আমরা ক'জন গ্রহণ করেছি? "নগ্ন ফকির" এক জনই। গান্ধীজীর বাণী মুখে নিয়ে যাঁরা বিদেশে গিয়েছেন, "নগ্ন ফকিরের" সগোত্র বলে তাঁদের দেখে ধারণা হবে না। পাশ্চাত্ত্য পোষাক ও পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ব্যক্তির মুখে গান্ধীজীর বাণী বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্যে মূর্ত হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

দেশের বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত সমাজ পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে বলে তাদের ভারতীয়করণ সম্ভব হয়নি। আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়ারদের লোহা কংক্রিট ইঁট দিয়ে প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরি করবার বিদ্যা শেখানো হয়। কিন্তু বাঁশ খড় মাটি দিয়ে কি করে সুন্দর সুদৃঢ় স্বাস্থ্যসম্মত বাড়ি তৈরি করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা নেই। তাই মোটা টাকা বেতনের ইঞ্জিনিয়ারের কৃতিত্বের প্রতি শতকরা নব্বই জন লোকের কোনো সহানুভূতি থাকা সম্ভব নয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের জীবনধারার মধ্যে আমরা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারিনি। দেশের লোকের মধ্যে শিক্ষা ও মানসিকতায় যদি বিরোধ থাকে তাহলে সামঞ্জস্য সম্ভব নয়। ফকিরের শততালিযুক্ত আলখাল্লার মতো দেশের মনেও সহস্র বিরোধের তালি পড়েছে। ইংরেজী শিক্ষার শক্তির উপর নির্ভর করে যারা এগিয়ে যেতে চেয়েছিল তারা বেশী দূরে যেতে পারেনি। পুরনো ভারতকে আঁকড়ে ধরে যারা আমাদের চারপাশে রয়েছে তারাই আমাদের অহরহ পশ্চাতে টানছে। সমাজের বৃহত্তর অংশের আকর্ষণ অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে আমরা প্রত্যেকেই দ্বৈত জীবন যাপন করছি। চিন্তায় ও জীবনে অবিচ্ছেদ্য প্রবল দ্বন্দ্ব অগ্রগতি ও বিকাশের মারাত্মক অন্তরায়। বিশেষ করে সৃষ্টিমূলক কোনো রচনা দৈনন্দিনের মধ্যে সম্ভব নয়। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে দু'শ বছরের মধ্যে সাহিত্যে, শিল্পে চিন্তার জগতে মৌলিক দান আমাদের কতটুকু তার হিসাব করা উচিত। বিজ্ঞান বহুলাংশে ব্যক্তি ও সমাজ-নিরপেক্ষ। তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক দান সম্ভব হয়েছে। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বরণীয় ব্যতিক্রম। এ ছাড়া যা-কিছু কাজ আমরা করেছি তার মূলে কথা একটি ঃ প্রাচীন ভারতের ব্যাখ্যা। একালের খ্যাতনামা দার্শনিকের কাছ থেকেও নতুন চিন্তার সন্ধান কিছু পাইনি। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনা ও তার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার মধ্যেই তাঁদের কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ। স্বাধীনতা আন্দোলনের কয়েক দশকের মধ্যে ভারতের বহু মনীষীকে কারাবাস করতে হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের সংঘাত থেকে দূরে থাকায় তাঁরা সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছিলেন। বিদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু আমাদের দেশে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রচিত হয়েছে গীতাভাষ্য, আত্মচরিত কিংবা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধের ঊর্ধ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে না পারলে জীবনের কোনো বিভাগেই মৌলিকতার আশা করা যায় না। যারা আধুনিক শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে পেছনে পড়ে আছে তাদের যতদিন আমাদের সমকক্ষ করে তুলতে না পারব ততদিন এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নেই।

লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় সংস্কৃতচর্চ্চা

ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ভারতবর্ষ যে অজ্ঞান-সুন্দর সাহিত্য-কুসুমের ডালিখানি উপহার দিয়েছে সেটি প্রধানতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের পুষ্পসম্ভারেই পরিপূর্ণ। হিমাচল হতে কন্যাকুমারী এবং গান্ধার হতে কামরূপ পর্যন্ত এই বিশাল ভূভাগের বহুবিচিত্র মননশক্তি স্ফূর্তিলাভ করেছিল সংস্কৃত সাহিত্যের অবিমুক্তক্ষেত্রে। যুগে যুগে নানাবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই এই দেববাণীর মন্দাকিনীধারা কখনো ফল্গুধারার মত, আবার কখনো কুলপ্লাবিনী নদীর মত প্রবাহিত হয়ে চলে এসেছে বর্তমানের বেলাভূমিতে। সংস্কৃত সাহিত্যের সংগে ভারতবর্ষের নিবিড় সম্পর্কের কথাটি বিশ্লেষণ করে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাতনামা আচার্য, সুবিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ডক্টর লুইস্ রেনন্ লিখেছেন

"There is no living culture without a living tradition. If, India is beloved and cherished among the elite of the west, it is on account of her traditional culture. And this culture is embodied above all in the treasures of Sanskrit. Sanskrit and India are inseparably connected, inspite of all the transitary harangues of the politicians".

ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম অতুলন অবদান হচ্ছে এই সংস্কৃত সাহিত্যের অনন্ত রত্নভাণ্ডার। মানবী-মনীষার পরমবিস্ময় এই সাহিত্যের রসধারায় নিখিল বিশ্বের রসপিপাসু বিদগ্ধগোষ্ঠী আজো বিস্মিত ও বিমুগ্ধ। বাংলার অবদান বিশেষ বৈশিষ্ট্যলাভ করেছিল সামগ্রিক ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাংগীণ এবং সার্থক রূপায়ণে। বাংলার মননশক্তি অন্যান্য নানাদিকের মত সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নব নব সৃষ্টির মধ্যে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। তারই অনুবর্তনে সংস্কৃত সাহিত্যের মণি-মঞ্জুষার যুগে যুগে বাঙালী যুগিয়ে এসেছে কত অমূল্য মণি-মাণিক্য। এই সুরসরস্বতীর স্রোতধারা বাংলাদেশের শ্যামল প্রান্তরে কখনো বিলুপ্ত হয়নি, শাসকের শোষণে বিস্মৃতির মরুপথে হারিয়ে যায়নি। বরঞ্চ মাঝে মাঝে ধারণ করেছে ভাদ্রের ভরা নদীর মত কূলপ্লাবিনী, কলনাদিনী রূপ।

বাংলাদেশে এমনি একটি সুসময় এসেছিল শান্তে এবং শান্তের সমান পারদর্শী সেন রাজাদের আমলে, ব্রহ্মণাসংস্কৃতির বিজয়চ্ছত্রতলে। "গুণী গুণং বেত্তি"— এই সংস্কৃত প্রবাদটিকে সেনবংশীয়েরা সার্থক করে তুলেছিলেন। বিদগ্ধ সেন রাজারা বিদ্বানদের যেমন উৎসাহ দিতেন, পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তেমনি নিজেরাও বিদ্যার চর্চা করতেন। ইতিহাসাচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার হিস্ট্রি অব্ বেংগল ভালুম-ওয়ান-এ বলছেন·

"They were not only generous patrons of learning and themselves men of learning, but they were also poets and friends of poets..... The king himself (Laksmanasena) and other members of the Royal family were literary men, and some of their verses are still preserved in the anthology of Sanskrit verses, called, "সদুক্তিকর্ণামৃতম," compiled by Sri Dharadasa. As noted above, Lakmana Sena also completed the astronomical work, "অদ্ভুতসাগর", begun by his father".

"যদ্ বীর্যস্তদপরাক্রমঃ" এই কথানুসারে পিতার শৌর্য-বীর্য-পরাক্রমের সংগে সংগে পাণ্ডিত্য

এবং কবিপ্রতিভারও সার্থক উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন লক্ষ্মণ সেন। দেখা যায়, দ্বাদশ শতকে বাংলার রাজসভা অপূর্ব মহনীয়তা লাভ করেছে প্রতিভাবান পণ্ডিতের শাস্ত্রচর্চায় এবং কীর্তিমান্ কবির কাব্যালাপে কেবল অসির ঝংকারে নয়। তাঁর একান্ত সুহৃদ্ এবং অন্যতম সভাসদ্ বটুদাস ছিলেন মহাসামন্ত চূড়ামণি। বটুদাসের সুযোগ্য পুত্র "সদুক্তিকর্ণামৃতম্" এর প্রস্তাবে পিতৃপরিচয় দিতে গিয়ে বল্‌ছেন—

"তস্যাসীৎপ্রতিরাজতন্বৃতমহাসামন্তচূড়ামণি —
নাম্না শ্রী বটুদাস ইত্যনুপমপ্রেমৈকপাত্রং সখা।"

এঁরই কুলচন্দ্র পুত্র শ্রীধরদাস ১১২৭ শকাব্দের ২০শে ফাল্গুন (১১ই ফেব্রুয়ারী, ১২০৬ খৃঃ) "সদুক্তিকর্ণামৃতম,"নামে একটি বৃহৎ, মনোজ্ঞ, সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রাচীন ও তৎকালীন ৪৮৫ জন কবির রচিত ২৩৭০টি সুন্দর শ্লোক এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। শ্রীধরদাসের কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত না হওয়ায় তিনি নিজে কবি ছিলেন কিনা সঠিক জানার উপায় নেই। তবে, শ্লোকসংকলন এবং শ্রেণীবিভাগে বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য দেখে মনে হয় সত্যি তিনি সুরসিক কাব্যবেত্তা ও সাহিত্য বোদ্ধা ছিলেন। ৫টি প্রবাহ বা অধ্যায়ে বিভক্ত এই মহাগ্রন্থে প্রতিটি প্রবাহে কয়েকটি বীচি বা তরংগ এবং প্রতিটি বীচিতে ৫টি করে মনোজ্ঞ শ্লোক বর্তমান। প্রতিটি শ্লোকের শেষে লেখকের নাম এবং অজ্ঞাত হলে "কস্যচিৎ" লেখা রয়েছে। প্রথম অমর প্রবাহে ৯৫টি বীচিতে বিভিন্ন দেবদেবীর লীলাবিষয়ক৪৭৫টি শ্লোক, দ্বিতীয় শৃংগার প্রবাহে ১৭৯টি বীচির ৮৯৫টি শ্লোকে প্রেম, নায়ক-নায়িকা, প্রেমবৈচিত্র্য, বিভিন্ন ঋতু ও প্রকৃতির নানা অবস্থার সরসবর্ণনা; তৃতীয় চাটু প্রবাহে ৫৪টি বীচির ২৭০টি শ্লোকে রাজার স্তুতি, বীরের বীর্য, যুদ্ধ, শত্রু, সেনা, কীর্তি, তূর্যধ্বনি প্রভৃতির বর্ণনা ও প্রশস্তি সূচক শ্লোকাবলী রয়েছে। আরো রয়েছে চতুর্থ অপদেশ প্রবাহে ৭২টি বীচির ৩৬০টি শ্লোকে দেবতাদের দোষগুণ, পার্থিব সংসার, তরু-লতা-পাতা, পশু-পাখী প্রভৃতির বর্ণনা এবং পঞ্চম উচ্চাবচ প্রবাহে ৭৪টি বীচির ৩৭০টি শ্লোকে গো, অশ্ব, মানুষ, পক্ষী, দেশ, কবি, গুণ স্থান প্রভৃতি নানা বিষয়ক বর্ণনামূলক শ্লোক। কবিদের নামের মালিকাটি দেখে মনে হয় অর্ধেকেরও ওপর হয়তো শ্রীধরদাসের সমসাময়িক নৈলে কিছু পূর্বের গৌড়ীয় কবি। এত কবির কলকণ্ঠে বংগভূমি মুখরিত হত একথা মনে ভাব্‌তেও আনন্দ হয়। এই সুজলা সুফলা দেশে কখনো কখনো বিত্তের ঘাট্‌তি দেখা গেলেও চিত্তের রিক্ততা কখনো ঘটেনি। এই সংকলনে জলচন্দ্র, যোগেশ্বর, বৈদ্যগংগাধর, সান্ধাধর, বৈতাল, ব্যাসকবিরাজ, কেবট, বঙ্গাল, পপীপ, গাংগোক, চন্দ্রচন্দ্র, বিম্বোক, শুংগোক প্রভৃতি যে অগণিত কবিদের সাক্ষাৎ পাচ্ছি, এঁরা সবাই যে গৌড়বংগেরই অধিবাসী ছিলেন—এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সমসাময়িক বাংলার সারস্বত পরিবেশের চমৎকার নিদর্শন এই সংকলনগ্রন্থ হতে তৎকালীন অনেক সংবাদ আমরা পাচ্ছি, যা স্তুতি, প্রশস্তি বা শিলালিপিতে পাইনা। জয়দেব যে বীররসাশ্রিত কাব্যরচনাতেও নিপুণ ছিলেন এবং মহাদেবেরও বন্দনা কর্‌তেন, তা এই গ্রন্থেই দেখ্‌তে পাই। রাজসভায় নানা সমস্যাপূরণ নিয়ে শ্লোক রচনার প্রতিযোগিতা চল্‌ত এবং লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, জয়দেব ও শরণ পাল্লা দিয়ে পদ রচনা কর্‌তেন— এই সংবাদ ও পাচ্ছি। এই গ্রন্থেই দেখি যে শরণদেব ও উমাপতিধর যেমন বিজয় সেন ও লক্ষ্মণ সেনের প্রশস্তি ও স্তুতি রচনা করেছেন, তেমনি রাজসভার বাইরে সাধারণ মানুষের লোকায়ত জীবনের নানা বিষয়কে অবলম্বন করে রচনা ক'রে গেছেন শ্লোকের পর শ্লোক। এই মহাগ্রন্থে অন্যান্য বহু সৎকবির মত বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন ও কেশব সেনের রচিত অনেক কবিতা কাব্যোৎকর্ষের জন্য স্বমহিমায় স্থান লাভ করেছে। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অনুবর্তনে এই কলারসিক সহৃদয় রাজা লক্ষ্মণ সেনেরও ছিল "পঞ্চরত্নী সভা"। জয়দেব গোস্বামী, গোবর্ধনাচার্য, শরণ, ধোয়ী ও উমাপতিধর—এই পঞ্চ পণ্ডিতের নাম পঞ্চরত্নরূপে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নবদ্বীপে রাজসভার প্রবেশপথে শ্লোকাকারে উৎকীর্ণ দেখেছিলেন

"গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ ।।

কবিরাজ হচ্ছেন "পবনদূতম্" এর কবি ধোয়ী। জয়দেব তাঁকে "কবিক্ষ্মাপতি" অর্থাৎ "কবিদের মধ্যে রাজা" এই বিশেষণে ভূষিত ক'রে উল্লেখ করেছেন। রাজসভায় আচার্য কবির সম্মান লাভ করেছিলেন বলে তিনি নিজেই "পবনদূতম্" এর শেষের দিকে বল্‌ছেন—"সদসি কবিতাচার্যকং ভূভুজাং মে।" স্বয়ং জয়দেব তাঁর অমৃতনিষ্যন্দী অমর কাব্য "গীতগোবিন্দম্"-এর চতুর্থ শ্লোকে এই পাঁচ জনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ক'রে বল্‌ছেন

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃংগারোত্তরসৎ প্রমেয়রচনৈরাচার্য গোবর্ধন —
—স্পর্ধী কোঽপিন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ ।।

"উমাপতিধর বাক্যকে বড়ই পল্লবিত করেন। দুরূহ পদের দ্রুত রচনায় শরণ হলেন সিদ্ধহস্ত। শৃংগার-রসাশ্রিত কাব্যের সৎ ও সুমিত রচনায় গোবর্ধন হলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কবিরাজ ধোয়ী শ্রুতিধর ব'লে বেশ বিশ্রুত। আর জয়দেব হলেন বিশুদ্ধ সন্দর্ভ অর্থাৎ নির্দোষ কাব্যরচনায় নিপুণ।"

এঁদের মধ্যে "গীতগোবিন্দম"-এর পদকর্তারূপে জয়দেবই সর্বাধিক পরিচিত এবং তাঁর কাব্যই সর্বাধিক পঠিত। কবিকুলপতি কালিদাসের পর একমাত্র তিনিই লাভ করেন সর্বভারতীয় খ্যাতি ও প্রীতি। তাঁর পদাবলীর লালিত্য, ছন্দের বৈচিত্র্য, শব্দের মাধুর্য ও কল্পনার সৌন্দর্য আজও মানব-মনকে লুব্ধ ও মুগ্ধ করে। পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে এবং বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জে "গীতগোবিন্দম্" এর মধুর পদাবলী আজও ভক্তিভরে গীত হয়। Buhler সাহেব সুদূর কাশ্মীরে "গীতগোবিন্দম্"এর পুঁথি খুঁজে পেয়েছিলেন। এই গ্রন্থরচনার একশত বৎসরের মধ্যেই সুদূর গুজরাটে অনহিলবাড়া নগরে প্রাপ্ত ১৩৪৮ সংবৎএর এক সংস্কৃত লেখের মংগলাচরণ শ্লোকরূপে এর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। শিখগুরু অর্জুন সংকলিত "গ্রন্থসাহেব" গ্রন্থে জয়দেব ভণিতাযুক্ত দুইটি কবিতা পাওয়া যায়। এইভাবে প্রায় সমগ্র ভারতেই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে একটি জনপ্রিয় কাব্যে পরিণত লাভ করে এই কান্তকোমল গীতিকাব্য। এই পর্যন্ত এই কাব্যের ৪০টি টীকা পাওয়া গেছে এবং টীকাকাররা বিভিন্ন দেশীয় ও বিভিন্ন ধর্মীয়। যেমন, বৃহস্পতি মিশ্রের টীকা, উদয়নাচার্যের ভাববিভাবিনী, রাণা কুম্ভের রসিকপ্রিয়া ভগবদ্দাসের রসকদম্ব-কল্লোলিনী, শংকর মিশ্রের রসমঞ্জরী, শ্রীহর্ষের টীকা, পূজারী গোস্বামীর বালবোধিনী, লক্ষ্মীধরের শ্রুতিরঞ্জিনী প্রভৃতি "গীত গোবিন্দম্"-এর প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত টীকাগ্রন্থ। এই অপূর্ব গীতিকাব্যের অনুকরণে রচিত অন্ততঃ ১৫টি অভিনব কাব্যও আমরা খুঁজে পাই। যেমন, ভানুদত্ত কবিচক্রবর্তীর গীতগৌরীশ, কল্যাণের গীতগংগাধর, রামভট্টের গীতগিরীশ, মিথিলাবাসী বংশমুনির গীতদিগম্বর, ভূধরপুত্র প্রভাকরের গীতরাসন, গয়াদীনের রামগীতগোবিন্দ, তিরুমলরাজের গীতগৌরী, হরিশংকরের গীতরাঘব, চতুর্ভুজের গীতগোপাল, গজপতিরাজ পুরুষোত্তমদেবের অভিনব গীতগোবিন্দ, শ্রীহরি আচার্যের জানকীগীত, জয়নারায়ণ ঘোষালের গীতশংকরীয়, নন্দদাসের পঞ্চাধ্যায়ী, গোবিন্দ দাসের সংগীতমাধব, দ্বারকানাথ ঠাকুরের গোবিন্দ বল্লভ নাটক।

কামের আবরণে বিশুদ্ধ প্রেমের মোহন প্রকাশই হয়েছে "গীত গোবিন্দম্"-এর শ্লোকাবলীতে। রসিক শেখর কৃষ্ণকিশোর এবং নায়িকাশিরোমণি রাইকিশোরীর লোকোত্তর লীলাবিলাসকে জয়দেব অপূর্বভাবে রূপায়িত করেন। প্রথমেই তিনি মেঘমেদুর অম্বরতলে তমাল-তরুর শ্যামল বনে রাধা-মাধবের বিজন-কেলির জয় ঘোষণা ক'রে ঈংগিতে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সূচনা কর্‌লেন

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ— ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃপ্রত্যধ্ব কুঞ্জদ্রুমং
—র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়। রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ।।

"গগনমণ্ডল ঘন মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন; বনভূমির রংগমঞ্চে, ঘনসন্নিবিষ্ট তমাল-তরুর নিবিড় শ্যামলিমায় কাজলঘন আঁধারের যবনিকা নেমে এসেছে; এদিকে আবার সমাগত হয়েছে রজনী। পূর্ব-রাত্রিতে অন্যনায়িকাসংগজনিত ভয়ে ব্যাকুলচিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে, হে রাধিকে, গৃহে নিয়ে যাও। নন্দের এইরূপ নির্দেশে পথিপার্শ্বের কুঞ্জকাননে প্রস্থান করেছেন তাঁরা। এখন যমুনা-পুলিনে নির্জনে রাধাকৃষ্ণের বিজনকেলি জয়যুক্ত হোক্।" তারপরের শ্লোকে কবি অতি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। তাতে পাই কবির শুচিসুন্দর বিনয়-নম্র চিত্তের শোভন পরিচয়

"বাগ্‌দেবতাচরিত-চিত্রিত-চিত্তসদ্মা শ্রীবাসুদেব-রতি-কেলি-কথা-সমেতম্
পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী এতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্ ।।

"যাঁর মনোমন্দির বাগ্‌দেবতার চরিত্রচিত্রে অলংকৃত, যিনি পদ্মাবতীচরণের শ্রেষ্ঠ পরিচারক, সেই জয়দেব কবি শ্রীবাসুদেবের রতিকেলিকথা অবলম্বন করে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।" অন্তিম শ্লোকেও আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বল্‌ছেন-

"শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য
পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু।"

"শ্রীভোজদেব এবং বামাদেবীর পুত্র জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যরচনা করে পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে এই কাব্যমালিকা উপহার প্রদান কর্‌লেন।"

জয়দেবের এই সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়দানের মধ্যে মেলে ভারতীয় আদর্শের চিরন্তন মানস-প্রবণতা। কেউ কেউ বলেন যে ভারতীয় মন ইতিহাস-সচেতন নয়, যার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস-আলোচনায় সন-তারিখাদি মালমশলার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু, তার কারণ তাঁদের অজ্ঞতা কিংবা অক্ষমতা নয়। ভারতবর্ষ চিরকাল অহংবোধকে বিলুপ্ত করার সাধনাই করে এসেছে। ঘোষণা এখানে লক্ষ্য নয়, এষণাই হচ্ছে আদর্শ। আমি বড়ো নই, আমি কি করেছি, সেটিই বড়োকথা। তাই, সন তারিখে কণ্টকিত করে নিজের জাগতিক ঐশ্বর্যের ঔদ্ধত্যকে লিপিবদ্ধ করে, অহমিকার অশোভন স্পর্ধাকে প্রতিষ্ঠিত করে তথাকথিত ঐতিহাসিক সচেতনতার পরিচয় তাঁরা দেন্‌নি সত্য। তাঁরা কিন্তু জানতেন অতুলন কালান্তরস্থায়ী 'যে সৃষ্টি তাঁরা করেছেন, সেইতো তাঁদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই সুসংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়দানের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁদের আত্মশক্তির ওপর অখণ্ড আস্থা এবং অহংবোধহীনতা। জয়দেবও ছিলেন সেই পথের পথিক। প্রসংগত তুলনা করতে ইচ্ছে হয় বর্তমানের অপরের সম্বন্ধে উন্নাসিক অথচ নিজের সম্বন্ধে একান্ত উৎসাহী আধুনিক মানসিকতাকে। নিজের জন্মবার্ষিকী হতে বিবাহবার্ষিকী পর্যন্ত অনেক কিছুই আজকাল প্রায়ই দেখি নিজের বাড়ীতে স্বনামে কিংবা বেনামে অনেকেই অনুষ্ঠিত করেন। বহু ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে তাঁদের সমক্ষে নিজের কল্পিত মাহাত্ম্য এবং গুণের উদ্‌ঘাটন করিয়ে থাকেন বশংবদ ব্যক্তিদের দ্বারা। অনেকে আবার অপরের লেখা আত্মসাৎ করে, কিংবা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে নিজের নামে প্রকাশ করেন। আর, তখনকার দিনের কত অপূর্ব রচনা পাচ্ছি, কিন্তু, লেখকের নামটি পর্যন্ত কোথাও নেই। এমন কি নিজের লেখা অপরের নামেও চালিয়ে দিতে কেউ কেউ কুণ্ঠিত হননি। তাঁরা বল্‌তেন, আমি নাই বা রৈলাম, আমার সৃষ্টি যদি থাকে, তবেই আমার তৃপ্তি। ফলে, যুগ যুগ ধরে কত অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনায় রামায়ণ-মহাভারতাদি মহাগ্রন্থ সমৃদ্ধ হয়েছে, বিরাট কলেবর ধারণ করেছে। আমরা গবেষণা করতে গিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ি, বের করতে চেষ্টা করি, কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত, কোনটাই বা আসল।

তারপর তিনি কুতূহলী সহৃদয় পাঠককে আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁর মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীর রসাস্বাদনে

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীম্
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্। শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্ ॥"

"যদি হরিকে স্মরণ করে মনকে সরস করার বাসনা থাকে, যদি তাঁর বিলাসকলা তথা রস-চাতুর্য জানার কৌতূহল হয়, তবে শ্রবণ করুন মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীর শ্রবণ-মংগল সুর-ঝংকার।"

"গীতগোবিন্দম্" ছাড়া জয়দেব গোস্বামী আরো অনেকগুলি প্রকীর্ণ কবিতা রচনা করেছিলেন। "সদুক্তিকর্ণামৃতে" "গীতগোবিন্দম্"এর যেমন ৫টি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, তেমনি তাঁরই বিভিন্ন বিষয়ক আরো ২৬টি বিচ্ছিন্ন কবিতাও উৎকলিত হয়েছে। এতেই দেখি, কেবলমাত্র ললিত পদবিন্যাসেই নয়, বীর রসাশ্রিত কবিতা রচনায়ও তাঁর নৈপুণ্য অতুলনীয়। বিভিন্ন ভাবাশ্রিত শ্লোক রচনায় তিনি যে একরকম সব্যসাচী ছিলেন, একথা আমরা অনেকেই ভুলে গেছি। প্রথম এই শ্লোকটি নিয়ে রাজসভায় উপনীত হন

"লক্ষ্মীকেলিভুজংগ জংগমহরে সংকল্প-কল্প-দ্রুম গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজকসভালংকার কারার্পিত—
শ্রেয়ঃ সাধকসংগ সংগরকলাগাংগেয় বংগপ্রিয়। প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল পালকসতাং দৃষ্টোঽসি তুষ্টা বয়ম্ ॥

"হে লক্ষ্মীর কেলিনায়ক, জংগমহরি, যাচকের কল্পতরু, মুক্তি সাধকের সহায়ক, যুদ্ধবিদ্যায় ভীষ্ম, বংগের প্রিয়, গৌড়েন্দ্র, রাজপ্রতিনিধি এবং সামন্তরাজন্যমণ্ডিত সভামণ্ডপের অলংকার, বন্দীকৃত-অরি-রাজ-মণ্ডল, সজ্জনের পালক, তোমাকে দেখলাম এবং এতেই আমরা তুষ্ট।" "সদুক্তি কর্ণামৃতে" জয়দেব রচিত মহাদেবস্তুতি বিষয়ক শ্লোকটি দেখে মনে হয় তিনি শুধু রাধাকৃষ্ণের লাস্যলীলার কবি ছিলেননা। বিদ্যাপতির মত তিনিও ছিলেন পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ। তাঁর বীররসাশ্রিত কবিতাগুলো পড়ে মনে হয় তিনি নিজের জীবনেও যুদ্ধ এবং বীরবসের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন। "গীতগোবিন্দম্"এর পাঁচটি শ্লোক ছাড়া জয়দেবের লেখনীপ্রসূত আরো যে ২৬টি শ্লোক ঐ শ্লোক সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে, তার দুয়েকটি লক্ষ্মণ সেনের স্তুতিমূলক; আর সবগুলোই যুদ্ধ, শৌর্য, বীর্য, তূর্যনিনাদ, সংগ্রাম, কীর্তি প্রভৃতি নিয়ে বিরচিত। মনে হয়, "বাগ্‌দেবতাচরিত-চিত্রিত-চিত্তসদ্মা।" জয়দেব বীররসাশ্রিত একটি কাব্য ও রচনা করেছিলেন এবং এই শ্লোকগুলো হয়তো সেই কাব্যেরই অংশ বিশেষ। কিন্তু, কালের করাল আক্রমণে এবং বৈদেশিকদের নির্মম অত্যাচারে আরো নানাগ্রন্থের মত এইটিই কালসমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেছে।

জাতিতে তন্তুবায় হলেও সারস্বত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন কবি ধোয়ী। সমাজের সর্বস্তরেই যে তখন সংস্কৃত চর্চার প্রচলন ছিল, ধোয়ীর উদাহরণ থেকে তা সহজেই বোঝা যায়। এক অলৌকিক উপায়ে ইনি সারস্বত সাধনায় সিদ্ধ হন বলে "সেকশুভোদয়ায়" এক সুন্দর গল্প আছে। ১০২টি শ্লোকে "কবিক্ষ্মাপতি" ধোয়ী মন্দাক্রান্তাছন্দে "পবনদূতম্" নামে একটি অপূর্ব কাব্য রচনা করেন। "মেঘদূতম্"এর অনুকরণে যে অসংখ্য দূতকাব্যের ধারা ভারতবর্ষে বয়ে চলেছিল, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল এই পবনদূতম্। রাধাকৃষ্ণের বিরহকে অবলম্বন করেই অধিকাংশ দূতকাব্য রচিত হলেও "পবনদূতম্"এর কবি সেই শৈলী পরিত্যাগ নতুন পথে পরিক্রমণ করেছেন। কোনো কাল্পনিক কিংবা পৌরাণিক ব্যক্তিবিশেষকে না নিয়ে বাস্তব জীবনের ঐতিহাসিক ব্যক্তি গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনকেই তিনি কাব্যের নায়করূপে গ্রহণ করেন। "মেঘদূতম্"এ বিরহের বার্তা প্রেরণ করেছিল নায়ক যক্ষ। আর এই কাব্যে কুসুমশরাহতা বিরহিণী নায়িকা প্রণয়-বার্তা প্রেরণ করেছেন নায়কের কাছে। মলয়পর্বতের গন্ধর্বরাজকন্যা মলয়বতী ছিলেন অশেষ রূপবতী এবং গুণবতী। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন দেশ জয় করে

করে সগৌরবে বিজয়ী রাজা লক্ষ্মণ সেন রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তাঁর বীরোচিত দেহের অনিন্দ্যসুন্দর রূপে মুগ্ধ এবং অতুলনীয় পাণ্ডিত্যাদি গুণগরিমায় অনুরক্ত হয়ে তিনি পবনমুখে প্রণয়-বার্তা প্রেরণ করেন গৌড়াধিপকে। এই হচ্ছে "পবনদূতম্"এর ঘটনা। ধোয়ীর কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে গুণগ্রাহী রাজা লক্ষ্মণ সেন তাঁকে "কবিক্ষ্মাপতি" অর্থাৎ "কবিদের মধ্যে রাজা" এই উপাধি এবং স্বর্ণাভরণযুক্ত হস্তিব্যূহ ও হেমদণ্ডযুক্ত চামর উপহার দিয়েছিলেন। "পবনদূতম্"এর ৯৯ সংখ্যক শ্লোকে তিনি আত্মপরিচয় দিয়ে বলছেন

"দন্তিব্যূহং কনককলিতং চামরং হেমদণ্ডং কাব্যং সারস্বতমিব মহামন্ত্রমেতজ্জগাদ॥"
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্তী। শ্রীধোয়ীকঃ সকল-রসিক-প্রীতিহেতোর্মনস্বী

"গৌড়রাজের নিকট হইতে পেয়েছে হস্তী কনকভার
লভেছে চামর হেমদণ্ড, চক্রবর্তী কবি কে আর?
সে শুদ্ধ ধোয়ীক ,রসিকচিত্তে করিতে মোহিত সে মতিমান্
কাব্য এ মহামন্ত্রের সম রচিল সরস্বতীর গান॥"

সুহ্মদেশের সুন্দর বর্ণনা করে কবি সেদেশের ব্রাহ্মণ-মহিলারা যে নূতন চন্দ্রকলার মত কোমল তালীপত্র কর্ণভূষণ রূপে পরিধান করতেন, তার উল্লেখ করছেন এই কাব্যে

"গংগা-বীচি-প্লুত-পরিসরঃ সৌধমালাবতংসো যত্র শ্রোত্রাভরণপদবীং ভূমিদেবাংগনানাং
যাস্যাত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ। তালীপত্র নবশশিকলাকোমলাং যত্র যাতি॥"

"গংগারতীরে অতি মনোরম সৌধশোভিত সুহ্মদেশ
রসময়ভূমি—যেয়ো সেথা তুমি, বিস্ময় তব লাগিবে বেশ।
সেথা সুকোমল শশীকলা সম কিশলয় তালীপত্র দিয়া
বর্ণভূষণ করিছে যতনে দ্বিজের যতেক পরাণ প্রিয়া॥"

সেন রাজবংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের কথার এবং দেবদাসী প্রথারও উল্লেখ পাই "পবনদূতম্"এ

দেবঃ সুহ্মে বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ। পাণৌ লীলাকমলমসকৃৎ যৎসমীপে বহন্ত্যো
"অস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো লক্ষ্মীশংকাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্বতে বাররামাঃ

"সেনবংশীয় রাজার দ্বারা দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে কমলাপতি মুরারি এই সুহ্মদেশে বসবাস করছেন। লীলাকমলধারিণী স্বভাবসুন্দর বারনরীরা সর্বদাই তাঁর কাছে অবস্থান করছে। ফলে, জনসাধারণ ভ্রমবশতঃ তাদের লক্ষ্মী বলে মনে করছে।" সুন্দরী তরুণীদের প্রণয়-লোভে তখনকারদিনেও যে তরুণদল সরোবরতীরে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াত, তার একটি সুন্দর চিত্র কবি তুলে ধরেছেন

"ক্রীড়াশোক-ক্রমুহকবহুলারামরম্যোপকন্ঠাঃ পীনোত্তুংগ-স্তন-ভরণমৎপামরিপ্রেমলোভান্
সংপৎস্যান্তেপথি পথি নব প্রীতয়ে প্রস্থিতস্য। নির্বিচ্ছেদ-ভ্রমিত-পথিকাঃ পল্লয়ঃ পল্বলিন্যঃ॥"

"অশোক গুবাক তরুরাজি দিয়ে উপবনে ঘেরা গ্রামের পর
ছোট ছোট কত পল্লী দেখিবে পথে যেতে আঁখি তৃপ্তিকর"
পীনপয়োধরা তরুণীর প্রেম লোভে লোভে সেথা তরুণদল
নিয়তই ঘোরে হেথা কভু পল্বলতীরে প্রেমবিহ্বল।"

নিরবধিকালের রসিকচিত্তে এই কাব্য যেন মর্যাদা লাভ করে, বেঁচে থাকে, এইতো কবির কামনা

"যাবচ্ছম্ভুর্বহতি গিরিজাসংবিভক্তং শরীরং যাবদ্রাধারমণ-তরুণীকেলিসাক্ষী কদম্ব—
যাবজ্জৈত্রং কলয়তি ধনুঃ কৌসুমং পুষ্পকেতুঃ। —স্তাবজ্জীয়াৎ কবিনরপতেবেষবাচাং বিলাসঃ॥"

"যতদিন হর গৌরীরে নিজ শরীরে বহন করি' যতদিন রাধা-কান্তের কেলি-সাক্ষী থাকিবে ভবে
রবে, যতদিন পুষ্পকেতু সে কুসুম ধনুটি ধরি; কদম তরুটি, ততদিন এই কবির কাব্য রবে।"

সেকালে স্বল্পে সন্তুষ্ট পণ্ডিত কবির ইহজীবনের চরম আদর্শ ধ্বনিত হয়েছে শেষের দিকে কবির আত্মকথায়

"গোষ্ঠীবন্ধঃ সরসকবিভির্বাচি বৈদর্ভরীতির— সৎসুস্নেহঃ সদসি কবিতাচার্যকং ভূভুজাং মে
বাসো গংগাপরিসরভূবি স্নিগ্ধভোগ্যাবিভূতিঃ। ভক্তিলক্ষ্মীপতিচরণয়োরস্তু জন্মান্তরেঽপি॥"

"সহৃদয় কবিদের সংগে, আত্মীয়স্বজনের ভোগে ধনৈশ্বর্যের ব্যয়, সজ্জনের সংগে মৈত্রী, রাজসভায় আচার্য কবির সম্মান এবং লক্ষ্মীপতি নারায়ণের চরণকমলে ভক্তি—এইসব যেন জন্মান্তরেও আমার হয়।" পরিণত বয়সে সংসার-সুখ-তৃপ্ত কবি জাগতিক সমস্ত বাসনা কামনা পরিত্যাগ করে ব্রহ্মপদে চিত্ত স্থির করতে বদ্ধপরিকর। ভোগাবসানে ত্যাগের পরম নির্লিপ্তির মধ্যে চরম শান্তির সাধনা করে চলেছেন মুমুক্ষু কবি। শাশ্বত কালের ভারতীয় কবিচিত্তের অন্তিম আকাংক্ষা কী সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে সর্বশেষ শ্লোকে-

"কীর্তির্লব্ধা সদসি বিদুষাং শীলিতাঃ ক্ষোণীপালা তীরে সম্প্রত্যমরসরিতঃ কদাপি শৈলোপকন্ঠে
বাক্সন্দর্ভাঃ কতিচিদমৃতস্যান্দিনো নির্মিতাশ্চ। ব্রহ্মাভ্যাস-প্রবণ-মনসা নেতুমীহে দিনানি॥"

"এই সুদীর্ঘ জীবনে বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছি, সংগ করেছি রাজার, কিছু অমৃতস্যন্দী কবিতাও রচনা করেছি এখন শৈলসুতাতটে কোন শৈলোপকন্ঠে বাকি দিনগুলি ব্রহ্মচিন্তায় কাটিয়ে দিতে চাই।" এই শ্লোকে ধোয়ী নিজেই বলছেন যে "পবনদূতম্" ছাড়া আরো কিছু কাব্য ও কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু, সেগুলি এখনো আমাদের হস্তগত হয়নি। তবে "সদুক্তিকর্ণামৃতম্"এ তাঁর ২০টি শ্লোক এবং জহ্লনের "সূক্তিমুক্তাবলীতে" ২টি শ্লোক এখনো দেখতে পাওয়া যায় এবং এইগুলি তাঁর প্রকীর্ণ শ্লোক বলেও মনে করা যেতে পারে।

দীর্ঘজীবী সুকবি উমাপতিধর বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন—এই তিনজনেরই রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। ইনি বল্লালসেনের মন্ত্রী ও লক্ষ্মণসেনের সন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে। রাজশাহী জেলায় দেওপাড়াগ্রামে প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দিরগাত্রে মহারাজ বিজয়সেনের যে ভাবগম্ভীর প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তার রচয়িতা হলেন এই শিল্পী কবি উমাপতিধর। এই প্রশস্তি বিভিন্ন ছন্দে রচিত অনেকগুলি রমণীয় কবিতার যেন একখানি মনোহর মালা। এই শিলালিপির শেষের দিকে এইটি তাঁরই রচিত বলে স্পষ্ট লেখা আছে এবং সেখানে যথার্থই বলা হয়েছে যে শব্দজ্ঞান ও শব্দার্থবোধের দ্বারা এই কবি ছিলেন পরিশুদ্ধ বুদ্ধি।

"........এষা কবেঃ পরপদার্থবিচারশুদ্ধবুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ।"

(Inscriptions of Bengal. Vol. III. Page 47)

এই প্রশস্তির ৪টি শ্লোক আবার "সদুক্তিকর্ণামৃতম্"এ গৃহীত হয়েছে। এই সংকলনগ্রন্থে উমাপতিধরের মোট ৯১টি শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে। তার মধ্যে এমন কয়েকটি শ্লোক আছে, যেগুলি আবার মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনেও রয়েছে। তাই, মনে হয় মাধাইনগর লিপিটিরও রচয়িতা ছিলেন এই উমাপতিধর। ইনি "চন্দ্রচূড়চরিতম্" বলে একটি কাব্যও রচনা করেন। মেরুতুংগ তাঁর "প্রবন্ধ চিন্তামণি"গ্রন্থে বলছেন যে উমাপতিধর লক্ষ্মণসেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। দেখছি, এখনকারমত যে কেউ তখন ভোটের জোরে মন্ত্রিত্বের গৌরবান্বিত আসনে বসতে পারতেন না। পরিশীলিত বুদ্ধি, পরিণত প্রজ্ঞা এবং পরিশুদ্ধ প্রতিভার অধিকারীরাই তখন মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হতেন। ফলে, রাজসভায় স্থাপিত হয়েছিল রাজনীতির সংগে সুনীতির পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা পরম শ্রদ্ধাভরে সেখানে সমাদৃত হত; আলাপ আলোচনায় রক্ষিত হত সমুচ্চ মান।

নানাপ্রকার বিষয়কে অবলম্বন করে ইনি কবিতা রচনা করেছেন। পল্লীবাসিনীরা যে তখনও নাগরিকদের তুলনায় নির্ধন এবং সরল ছিল, তার একটি সুন্দর চিত্র অংকন করেছেন উমাপতিধর—

"মুক্তা কার্পাসবীজৈর্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবু
পুষ্পৈ রূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমীনাম্।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকশিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষান্তে ত্বৎপ্রসাদাদ্ বহুবিভবজুষাং যোষিতং শ্রোত্রিয়াণাম্॥"

"বহুবিভবশালী হলেও শ্রোত্রিয় রমণীরা নাগরিকাদের কাছে শিক্ষালাভ করছে, মুক্তা কার্পাসবীজের মত, মরকত শাকপাতার মত, রত্ন পাকা ডালিমের বীজের মত, আর সোনা কুমড়োফুলের মত।" তখনকারদিনে জাংগলিক অর্থাৎ বিষবৈদ্যেরাও রাজসভায় সম্মানের স্থান লাভ করত—এইটিও পাচ্ছি তাঁর একটি সাপ খেলানোর শ্লোকে। তুর্কিদের সংগে লক্ষ্মণসেনের যে যুদ্ধ হয়েছিল, তারও উল্লেখ পাই তাঁর আরেকটি শ্লোকে-

"সাধু, ম্লেচ্ছ নরেন্দ্র, সাধু, ভবতো মাতৈব বীরপ্রসূর্—
নীচেনাপি ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ততে।
দেবে কুপ্যতি যস্য বৈরিপরিষ্মারাংকমল্লেপুরঃ
শস্ত্রং শস্ত্রমিতি স্ফুরন্তি রসনাপত্রান্তরালে গিরঃ॥"

"ম্লেচ্ছরাজ, সাধু। আপনার মাতাই যথার্থ বীরপ্রসবিনী। নীচ হলেও আপনার মত লোকের জন্যই পৃথিবী এখনো সুক্ষত্রিয়া। কেননা, মারাংকমল্লদেব অর্থাৎ লক্ষ্মণসেন যখন সাক্ষাৎভাবে শত্রু-সৈন্য ধ্বংস করছিলেন তখন আপনার রসনারূপ পত্রের অন্তরাল হতে "শস্ত্র শস্ত্র" এই বাক্য ঘন ঘন নির্গত হচ্ছিল।" "সদুক্তিকর্ণামৃতম্"এর শৃংগার প্রবাহে উমাপতিধরের একটি অপূর্ব কাব্যশোভাময় শ্লোক আছে, যাতে মেলে তাঁর সূক্ষ্ম এবং সুন্দর কবিদৃষ্টির পরিচয়। "বনবিহারকালে একটি রমণীয়া রমণী পায়ের আংগুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওপরের তরুশাখা হতে পুষ্প চয়ন করছেন; ফলে, বাহুমূল ঊর্ধ্বে উত্তোলিত, ঊর্ধ্বপ্রয়াসে স্তন ঈষদুন্মুক্ত, বসন ঈষদ্ স্খলিত হওয়ায় সুগভীর নাভিটিও দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করছে।"

"দূরোদঞ্চিত বাহুমূলবিলসচ্চীনপ্রকাশস্তনা আকৃষ্টোজ্ঝিত-পুষ্পমঞ্জরিরজঃ পাতারুরুদ্ধেক্ষণা
ভোগাব্যায়ত মধ্যলম্বিবসনানির্মুক্তনাভিহ্রদা। চিন্বত্যাঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃশঃ পাদাগ্রদুঃস্থাতনুঃ॥

কবি শরণের কোনো অখণ্ড কাব্য পাওয়া না গেলেও বহু বিচ্ছিন্ন কবিতা পাওয়া গেছে। তাঁর ২০টি শ্লোক "সদুক্তিকর্ণামৃতম্"এ উদ্ধৃত হয়েছে। এই শ্লোকগুলিতে মেলে তাঁর দুর্লভ কবিত্ব-শক্তির শোভন প্রকাশ। একটি শ্লোকে সুন্দরভাবে ইনি লক্ষ্মণ সেনের বিজয়-কীর্তির বর্ণনা করছেন

"ভ্রূক্ষেপাদ্ গৌড়লক্ষ্মীং জয়তি বিজয়তে কেলিমাত্রাৎকলিংগান্
চেতশ্চৈদ্যক্ষিতীন্দোস্তপতি বিতপতে সূর্যবদ্ দুর্জনেষু।
ম্লেচ্ছান্ ম্লোচ্ছান্ বিনাশং নয়তি বিনয়তে কামরূপাভিমানং
কাশীভর্তুঃ প্রকাশং হরতি বিহরতে মূর্ধ্নি যো মাগধস্য॥"

"ইনি ভ্রূক্ষেপেই গৌড়লক্ষ্মীকে জয় করেছেন, কলিংগদেশ জয় করেছেন-খেলার ছলে, চেদিরাজের চিত্তকে ক্লিষ্ট করেছেন, দুর্জনদের ওপর সূর্যের মত তাপ বর্ষণ করছেন, ইচ্ছামাত্রই ম্লেচ্ছদের বিনাশ সাধন করেছেন, কামরূপরাজের অভিমান বিলুপ্ত করেছেন, কাশীনরেশের কীর্তি হরণ করেছেন এবং প্রভুত্ব করেছেন মগধরাজের ওপর।" জয়দেব এঁর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন— "শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে"—অর্থাৎ দুরূহ কাব্যের দ্রুতরচনায় শরণ হলেন সিদ্ধ হস্ত।" কেবল রাজসভার জাঁকজমকেই এই কবির দৃষ্টি ধাঁধিয়ে যায়নি, অতি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-চর্যা তথা "শুধু প্রাণধারণের দিন যাপনের গ্লানি"-ও তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। রাজসভার পাষাণ-প্রাচীর উল্লংঘন করে দরিদ্র গ্রাম্য

কৃষকবধূর কর্মকঠোর জীবনের বাস্তব ছবিটি কবি শরণ এই শ্লোকটিতে তুলে ধরেছেন—

"এতাস্তা দিবসান্তভাস্করদৃশো ধাবন্তি পৌরাংগনাঃ প্রাতর্যাতকৃষীবলাগমভিয়া প্রোৎপ্লুত্য বর্ত্মচ্ছিদো
স্কন্ধপ্রস্খলদংশকাঞ্চলধৃতিব্যাসংগবন্ধাদরাঃ। হট্টক্রয্যপদার্থমূল্যকলন-ব্যগ্রাংগুলিগ্রন্থয়ঃ ।।"

"মেয়েরা সব ছুটে চলেছে, সায়ংকালীন সূর্যের মত অরুণ তাদের চোখ; ছুটে চলার জন্য মাথার আঁচল বার বার খসে পড়্ছে; আর তা তুলে দেওয়ার জন্য তারা ব্যগ্র হয়ে উঠ্ছে; কোন্ সকালে চাষী বেরিয়ে গেছে; এখন তার ফিরে আসার সময় হয়েছে ভেবে তারা লাফিয়ে লাফিয়ে পথ সংক্ষেপ করে চল্ছে। এদিকে তাদের আংগুলগুলো আবার হাটের বেচাকেনার হিসেবে ব্যস্ত।" রিক্তা কৃষাণীর কঠোর জীবনচর্যা কবির সংবেদনশীল মনে রেখাপাত করেছে। কৃষকপতির একার আয়ে সংসার চলেনা বলে সতী পত্নী হাটে বেচাকেনা করে। সারাদিনের পরিশ্রমে স্বভাবকোমলা নারী শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। চোখ লাল। পতিপ্রেমের মহিমায় সে আবার মহিমময়ী। নিজে ক্লান্ত হলেও পতির কষ্টের কথাই সে ভাবছে। পতির পূর্বেই ঘরে ফিরে পতিসেবার মাধ্যমে কুলবধূর কর্তব্যপালনে সে উন্মুখ। দুর্ভাগ্য-বশতঃ, তাকে হাটেবাজারে বেরোতে হলেও সে ভোলেনি যে—"নারীণাং ভূষণং লজ্জা" সে যে কল্যাণী গৃহবধূ এই তো তার গৌরব। তাই, স্খলিত অঞ্চলকে মাথায় তুলে দিতে তার চেষ্টার অন্ত নেই। প্রসংগতঃ, তুলনা করতে ইচ্ছে হয় বর্তমানের চাকুরিজীবিনী অধিকাংশ আধুনিকাদের।

আচার্য গোবর্ধন ছিলেন "আর্যাসপ্তশতী" নামক বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা। কবি হাল বিরচিত প্রাকৃত কাব্য "গাথা সপ্তশতীর" অনুসরণে এই লিখিত হয়েছে। তাঁর শিষ্য উদয়ন এবং ভ্রাতা বলভদ্র তাঁকে এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ সাহায্য করেন। "আর্যাসপ্তশতীর" শেষের দিকে এই কথাই তিনি বল্ছেন

"উদয়নবলভদ্রাভ্যাং সপ্তশতী শিষ্যসোদরাভ্যাং নঃ।
দ্যৌরিব রবিচন্দ্রাভ্যাংনঃ প্রকাশিতা নির্মলীকৃত্য ।। ৭৩০ ।।
বিরচন্ বামনশীলাং বামনইব কবিপদং লিপ্সুঃ।
অকৃতার্যাসপ্তশতীমেতাং গোবর্ধনাচার্যঃ ।।৭৩১।।

পণ্ডিত কবির বিনয়ও এখানে লক্ষ্যণীয়। কবিপিতা নীলাম্বরও ছিলেন সুকবি। কাব্যের প্রারম্ভেই বশ্যবাক্ কবি ভবভূতির পরেই পিতার বন্দনা করেন। জয়দেব এঁর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করাতে গিয়ে বল্-ছেন—"শৃংগারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্যগোবর্ধনঃ" "শৃংগার রসের সৎ ও সুমিত রচনায় আচার্য গোবর্ধন হলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। "ব্রাহ্মণ্যে ও তেজস্বিতায় এই আচার্য ছিলেন অদ্বিতীয়।" "সেকশুভোদয়া"য় গল্প আছে, বণিকবধূ মাধবীর ওপর রাজশ্যালক কুমারদত্ত রাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় অত্যাচার করতে যায়। রাণীর ভয়ে রাজা লক্ষ্মণ সেন এবং মন্ত্রিবর্গ নিষ্ক্রিয় থাকেন। অধিকন্তু বিচার প্রার্থী মাধবীকে রাণী কেশাকর্ষণ করে পদাঘাত করেন। তখন এই তেজস্বী আচার্যই রাণীকে হত্যা করতে উদ্যত হন এবং রাজাকে তীব্র তিরস্কার করেন—"ভবান্ যাদৃশো ধার্মিক স্তাবদবগতম্, শ্রীমতাং রাজ্যম্ অচিরেণৈব নষ্টং ভবিষ্যতি।" এই অভিশাপ প্রদান করে দণ্ডকমণ্ডলু নিয়ে তিনি কলুষিত রাজসভা পরিত্যাগ করে চল্লেন। তখন, রাজার চৈতন্যোদয় হল এবং অন্যায়ের প্রতিবিধান করে আচার্য কবিকে নিরস্ত করলেন।

৭৩১টি শ্লোকে আর্যাচ্ছন্দে "আর্যাসপ্তশতী" রচিত হয়েছে। তখনকার অনেক সামাজিক রীতি-নীতি এই গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি। তখনও যে বিবাহিতা সধবা মহিলারা সিঁদুর ধারণ কর্-তেন, গোবর্ধনাচার্যের শ্লোকে তার উল্লেখ আছে

"বন্ধনভাজোঽমুষ্যাঃ চিকুরকলাপস্য মুক্তমানস্য।
সিন্দূরিতসীমন্তচ্ছলেন হৃদয়ং বিদীর্ণমেব ।।"

"কবরীবন্ধনে সুক্তমান এই নারীর কেশপাশ যেন সিঁথির সিঁদুরের ছলে হৃদয় বিদীর্ণ করছে।"

নাগরিকাদের নির্লজ্জ আচরণ পল্লী অঞ্চলে নিন্দনীয় ছিল— এই নিয়ে আচার্য বলছেন

"ঋজুনা নিধেহি চরণৌ পরিহর সখি নিখিলনাগরাচারম্।
ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেঽপি দণ্ডয়তি।"

"সখি, সরল পদক্ষেপে চল; নাগরাচার ত্যাগ কর। কটাক্ষপাত করলে ও এখানে গাঁয়ের মোড়ল ডাইনী বলে দণ্ড দিয়ে থাকে।"

এই পাঁচজন ছাড়া হলায়ুধ ছিলেন সেই যুগের অন্যতম যুগন্ধর পণ্ডিত এবং রাজসভায় সর্বাধিক প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে ও ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠার অদ্বিতীয় এই কবিপণ্ডিত ছিলেন রাজার বাল্যসুহৃদ মন্ত্রী ও মহাধর্মাধ্যক্ষ। এঁর পিতা বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ধনঞ্জয়ও ছিলেন ধর্মাধ্যক্ষ; মাতার নাম উজ্জ্বলা। হলায়ুধের দুই অগ্রজ ঈশান এবং পশুপতিও ছিলেন মহাপণ্ডিত। ঈশান "আহ্নিক পদ্ধতি" নামে একটি গ্রন্থ এবং পশুপতি "শ্রাদ্ধপদ্ধতি" ও "পাকযজ্ঞ" নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নিজে "ব্রাহ্মণসর্বস্বম্", "মীমাংসাসর্বস্বম্", "শৈবসর্বস্বম্", "বৈষ্ণবসর্বস্বম্" এবং "পণ্ডিত সর্বস্বম্" নামে পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্লোকরচনায় ও তাঁর নৈপুণ্য অতুলনীয়। "ব্রাহ্মণ সর্বস্বম্"-এর উপক্রমে তাঁর যে প্রশস্তি আছে, তাতে মনে হয় তিনি এক অসাধারণ পুরুষ ছিলেন।

"বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
—ছত্রোৎসিক্তমহামহত্তমপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে। শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতি ধর্মাধিকারং দদৌ ।।

"অখিল ভূপালগণের নারায়ণস্বরূপ শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেনদেব তাঁকে বাল্যে রাজপণ্ডিতপদে স্থাপন করেন, নবযৌবনে চন্দ্রের মত উজ্জ্বল শ্বেতছত্রমণ্ডিত মহামন্ত্রিপদ দান করেন, পরিশেষে প্রৌঢ়বয়সের যোগ্য মহাধর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন।" নিয়ত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ফলে তাঁর গৃহ পবিত্র হয়ে উঠেছিল

"পাত্রং দারুময়ং ক্বচিদ্বিজয়তে হৈমং ক্বচিদ্ ভাজনম্
কুত্রাপ্যস্তি দুকূলমিন্দুধবলং কুত্রাপি কৃষ্ণাজিনম্।
ধূমঃ ক্বাপিবষট্কৃতাহুতিকৃতো ধূমঃপবঃ ক্বাপ্যভূদ্
অগ্নেঃ কর্মফলং চতস্য যুগপজ্জাগর্তি যন্মন্দিরে ।।

"কোথাও কাঠের যজ্ঞপাত্র, কোথাও বা সোনার বাসনপত্র ছড়িয়ে আছে। একদিকে ইন্দুশুভ্র পট্টবস্ত্র, আরেকদিকে কৃষ্ণমৃগচর্ম। কোন স্থান ধূপের গন্ধে সুরভিত, আবার কোনও স্থান বষট্কারধ্বনির সংগে প্রদত্ত আহুতির ধূমে প্রধূমিত। এইভাবেই অগ্নির এবং তাঁর নিজের কর্মফল তাঁর নিজের গৃহে একসংগেই জাজ্বল্যমান" এই সব কারণে তাঁর যশোগরিমা ছড়িয়ে পড়েছে দিক্‌দিগন্তরে।—

"আপীয় শ্রুতিসংপুটেন হৃদয়ে সংস্থাপিতাঃ সূরিভিঃ
র্বিন্যস্তাঃ সুরসদ্মনিশ্চলশিলাঃ পট্টান্তরে শিল্পিভিঃ।
আবদ্ধাঃ কবিভির্বিশৃংখলকথাবন্ধৈঃ প্রবন্ধৈরপি
ভ্রাম্যন্তি প্রতিপত্তনং প্রতিগৃহং প্রত্যাংগনং যদ্গুণাঃ ।।

"মনীষীরা তাঁর গুণ কর্ণদ্বারা পান করে হৃদয়ে সংস্থাপিত করেছেন, শিল্পীরা অংকিত করেছেন দেবায়তনের শিলাতলে অথবা পট্টাম্বরে বা পাঠায়; কবিরা গেঁথেছেন গদ্যে এবং পদ্যে; আর এইভাবেই তা' প্রতি নগরে, প্রতি গৃহে, প্রতি অংগনে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে।"

উপনিষদ্ বলেছেন—"ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যঃ"—"কেবল বিত্তের দ্বারা মানুষ তৃপ্ত হয় না।" "বিদ্যয়াঽমৃতমনুতে"—"বিদ্যার দ্বারাই অমৃতকে অর্জন-করতে হয়।" এইভাবে কবিচক্রবর্তী এবং পণ্ডিত কুলপতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রাজচক্রবর্তী লক্ষ্মণ সেন বংগে সুরভারতীর অংগনতলে প্রতিষ্ঠা করেন সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ।

ইতিহাসং পুরাতনম্

কল্যাণী দত্ত

সেকালের বীরগাথায় কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বীরের কীর্তিকলাপ, তার জীবনের ঘটনাবলী প্রথমে সাড়ম্বরে বর্ণনা করা হোত এবং সেই সঙ্গে উক্ত বীরের পূর্ব এবং উত্তর পুরুষেরও গুণানুকীর্তন জুড়ে দেওয়া থাকত। দীর্ঘকাল ধরে অতি মন্থর গতিতে জোড়াতালির এই কাজ বাড়তে বাড়তে মূল গাথাটি তার অসংখ্য শাখাগাথার সঙ্গে জড়িত হয়ে শেষে মহাকাব্যের রূপ নিত।

গ্রীক, ল্যাটিন বা এ্যাংলো স্যাক্সন এপিকের লক্ষণের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় এপিক রামায়ণ মহাভারতের লক্ষণ পুরোপুরি মেলে না। আমাদের মহাকাব্য বীররস প্রধান নয়। ইয়াকবি, ভিন্‌তারনিৎস্, বেবর ম্যাক ডোনেল, মনিয়র উইলিয়াম্‌স্ প্রমুখ বিদেশী পণ্ডিত এবং রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্র সুন্দর, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি এদেশের মনীষীরা এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট আলোচনা বহুকাল পূর্বেই করেছেন। বলা বাহুল্য মধ্যযুগে কালিদাস, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি মহাকবিরা অলঙ্কার—শাস্ত্রসম্মত যেসব মহাকাব্য বা সভাকাব্য ('কোর্ট-এপিক ' অর্থাৎ যে কাব্য রাজার আনুকূল্যে রচিত ও পঠিত হয়ে পরে সাধারণের সমাদর লাভ করত) রচনা করেন বীর গাথার সঙ্গে তাদের প্রায় কিছুই সম্পর্ক নেই।

গত শতাব্দীতে টড্ সাহেব তাঁর 'অ্যানাল্‌স্ এ্যান্ড এ্যান্টিকুইটিস অব রাজস্থান' গ্রন্থে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীরগাথার নমুনা অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। ভারতবর্ষের অন্য অন্য প্রান্তে অনেক প্রাচীন বীরগাথাই সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। রাজসভায়, যুদ্ধযাত্রায়, অভিষেক ও বিবাহ-উৎসবে এবং শবযাত্রাকালে এই ধরণের গাথা বা তার সংক্ষিপ্তসার সভরা-চর গীত হোত। কালিদাস ও বাণভট্টের সাহিত্যে আমরা এসংবাদ পেয়েছি। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর— 'শশাঙ্ক' উপন্যাসে সুপ্রসিদ্ধ হরিষেণ প্রশস্তির এক অতি সুন্দর ও কাব্যময় অনুবাদ করেছেন। সেখানে দেখি রাজপ্রাসাদের এক বৃদ্ধচারণ বালক শশাঙ্ক গুপ্তকে সম্রাট্ সমুদ্র গুপ্তের ঐ কীর্তিগাথা শোনাচ্ছে।

আমাদের দুখানি মহাকাব্যই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বৃহৎ বনস্পতির মত দেশের ভূতলজঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া দেশকে আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে।" এমন অবস্থায় এদের মহাকাব্য না বলে দেশকাব্য আখ্যা দিলেই যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। সভাকাব্য হলে বোধকরি এদের নাম হোত যথাক্রমে দশাননবধ ও দুর্যোধনবধ। দেশকাব্যকেই "সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী" আশ্রয় করতে পারেন। বাস্তবিক বর্তমান মহাভারতে মূল আখ্যানের সঙ্গে অসংখ্য অবান্তর উপাখ্যান, ধর্ম অর্থ ও কাম শাস্ত্র, নীতি ও বার্তা, রাজধর্ম বা দণ্ডনীতি, তন্ত্র, স্মৃতি এবং বহুবিধ দর্শন, দেবতা ও তীর্থ মাহাত্ম্য—বিভিন্ন সময়ে এসব এমনভাবে মিশেছে যে তাকে এক ব্যক্তির রচিত একখানি গ্রন্থ না বলে বহুজনের বহুযুগ ধরে সৃষ্ট এক বিপুল সাহিত্য বলাই যুক্তিসঙ্গত।

মহাসাগরের তুল্য বিশাল লক্ষ শ্লোকাত্মক এই মহতী সংহিতা থেকে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের সেই আদিম গাথা যা একদা চারণদের মুখে মুখে গীত হোত, তা খুঁজে পাবার কোন উপায়ই আজ নেই। ডাক্তার ভিন্‌তার নিৎস্ তাই বলেছেন "the mahabharata in particular has almost completely lost the character of an epic" তিনি অনেক পরিশ্রম করে প্রাচীন কালে প্রচলিত অন্যান্য বীরগাথার অনুসন্ধান করে ভরত, যযাতি, নহুষ, নল এবং বিদুলার উপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন ।[২]

মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্বে ভগবদ্‌যান পর্বাধ্যায়ে বিদুলার এই গাথাটির দিকে ভিন্‌তার নিৎস

এবং তাঁরও আগে ইয়াকবি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জার্মান ভাষায় ১৯০৩ ও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এদেশে অবশ্য আমরা ভিন্‌তার্‌ নিৎসের-গ্রন্থের ইংরেজী অনু-বাদটির (প্রথমসংস্করণ— অনুবাদ মিসেস্‌ কেট্‌কার ১৯২৭ খৃঃ) সঙ্গেই বেশী পরিচিত। এই গ্রন্থের মারফৎই এদেশে যাঁরা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চা করেন তাঁরাও এই প্রাচীন গাথাটির অস্তিত্বের কথা জানতে পারলেন বললে খুব অত্যুক্তি হবেনা।

মহিষী বিদুলা কথিত এবং আমাদের আজকের আলোচ্য এই বীরগাথার বয়স কত ঠিক বলা না গেলেও এটি সম্ভবতঃ মহাভারতের চেয়েও পুরোণো। এই গাথা প্রথমে মহিষী বিদুলা তাঁর পুত্র সঞ্জয়কে বলেন। এর উৎপত্তি সিন্ধু সৌবীর দেশে। রাজা কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা পৃথা অর্থাৎ কুন্তীদেবী বাল্যকালে পিতৃগৃহে— সমাগত বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ অথবা চারণদের মুখে লোকপরম্পরাক্রমে আখ্যাত এই গাথা শুনে অভ্যাস করেছিলেন। কুন্তী নিজেই বলেছেন "ইতিহাসং পুরাতনম্"। তার পর কুন্তী এ গাথা কৃষ্ণকে বলেন এবং কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে। ভিন্‌তার নিৎস্‌ বলেছেন "This torso of a heroic poem is one of the few portions of the mahabharata which have remained entirely untouched by brahmanical influence."

তিনি এই অতুলনীয় বীরগাথায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাবমুক্ত এবং অবিকৃত নিদর্শনটির বিস্তর প্রশংসা করে কাহিনীর চুম্বক এবং বিদুলার উক্তি থেকে সাতটি সুন্দর শ্লোকের অনুবাদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

আমরা যতদূর জানি তাবৎ ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাঙ্গলা ভাষাতেই বিদুলানুশাসন প্রথম আংশিক অনূদিত এবং আলোচিত হয়। বাঙ্গলা ১৩৪০-৪১ সালে 'নব নির্মাল্য' পত্রিকায় শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্তের 'মহাভারতে বিদুলা' প্রবন্ধে মূলের বহু শ্লোক উদ্ধৃত এবং অনূদিত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় তার সাধারণের মধ্যে প্রচার হয়নি সুতরাং মহিষী বিদুলা পাঠকের কাছে এতদিন প্রায় অপরিচিতই ছিলেন এবং হয়ত তাই থেকেও যেতেন যদি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথতর্কবেদান্ততীর্থ তাঁর "প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি" গ্রন্থে এই বিদুলানুশাসনের বিস্তৃত অনুবাদ ও আলোচনা না করতেন। (উক্ত গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ পৃঃ ১০৫-১১৫ দ্রষ্টব্য) গ্রন্থকার বলেছেন, "বিদুলানুশাসন শুধু মহাভারতের নহে ভারতীয় সভ্যতারই উজ্জ্বল রত্ন। এদেশে যাঁহারা সংস্কৃতবিদ্যার অভ্যাস করেন তাঁহাদের মধ্যেও ইহার আলোচনা নাই, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের এবং জাতীয় দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

কথাটি অত্যুক্তি নয়। মহাভারতের কোনও বাঙলা সংস্করণেই (অনুবাদে নয়) বিদুলার কাহিনী নেই। মাইকেল এবং বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত বাঙলা সাহিত্যে কোনও প্রতিভাবানের সবিশেষ দৃষ্টি এই অনুশাসনের দিকে পড়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বাঙলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় এমন পণ্ডিত দেশে যথেষ্ট ছিলেন যাঁরা আদ্যন্ত মহাভারত সযত্নে পাঠ করেছিলেন। অথচ পরাধীন জাতির জাতীয় সঙ্গীত হবার উপযুক্ত এই বীর গাথাটি যে বাঙালী দেশপ্রেমিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল, তা মহামহোপাধ্যায়ের ভাষায় নিশ্চয় আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্য।

উদ্‌যোগপর্বে শ্রীকৃষ্ণের মুখে তাঁর দৌত্য অর্থাৎ শান্তি প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে জেনে মনস্বিনী কুন্তী

১। 'হিস্ট্রি অব্‌ ইণ্ডিয়ান লিটারেচর'—প্রথম সংস্করণ পৃঃ ৩৭৫—৩৮৭ 'এন্‌সিয়েন্ট হিরোইক্‌ পোয়েট্রি ইন্‌ দি মহাভারত' অংশ দ্রষ্টব্য।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর বক্তব্য ও উপদেশ তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের কাছে নিবেদন করলেন। পাছে যুধিষ্ঠির আবার শান্তির প্রস্তাব করেন এ আশঙ্কা কুন্তীর মনে সর্বদা উপস্থিত ছিল। কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বলেন—"পুত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের মত ক্রমাগত ধর্মচর্চা করে তোমাদের ক্ষাত্রবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যে বুদ্ধিতে তুমি অধুনা চালিত হচ্ছ, সে বিকৃত বুদ্ধির উপদেশ তোমাকে তোমার পিতৃপিতামহ দেন নি, আমিও দিই নি। মনে রেখো বাহুবল চর্চাই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। তুমি উত্থিত হও এবং বাহুবলে বিজিত পৃথিবী ভোগ কর ও যথাবৎ দান যজ্ঞে প্রবৃত্ত হও। আশীর্ব্বাদ করি তোমার প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা এবং শৌর্য বৃদ্ধিলাভ করুক। মনে রেখো তোমার জননী হয়ে আমি আজ পরান্নের প্রত্যাশী। যুদ্ধ কর। কর্তব্যচ্যুত হয়ে পিতৃপুরুষকে নরকস্থ কোর না।"

এই পর্যন্ত বলে প্রাচীন ইতিহাস থেকে তাঁর 'দয়াশীল সন্তুষ্ট এবং অনুদ্যোগী' ও ধার্মিক পুত্রকে উদ্দেশ করে—কুন্তীদেবী 'দয়া সন্তোষ ও অনুদ্যমে'র নিন্দাসূচক এক বিধবামহিষী এবং তাঁর রাজ্য-ভ্রষ্ট ও যুদ্ধবিমুখ পুত্রের যে উপাখ্যান কৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন—সেটিই প্রসিদ্ধ বিদুলানুশাসন। সৌবীরদেশের* সঙ্গে সিন্ধুদেশের বিবাদে সৌবীর রাজ সঞ্জয় পরাজিত ও রাজ্যহীন হয়ে যখন নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁকে উত্তেজিত এবং উদ্‌যুক্ত করবার জন্য তাঁর বিধবা মাতা 'দীর্ঘদর্শিনী' বিদুলা যে উদ্দীপ্ত ভাষণ দেন তা জগতের ইতিহাসে একটি সুপ্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ গাথা। পুত্র সঞ্জয় মাতার দৃঢ়তায় শুধু বিস্মিত হন নি, ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। প্রথমে এ তেজ তাঁর কাছে হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতা বলে মনে হয়েছিল। তাই যুদ্ধে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তাঁর বিধবা মাতার জীবন যে শূন্য ও নিরানন্দ হয়ে যাবে, তাছাড়া তাঁর যে মিত্রবল ও অর্থবল নেই, এ অবস্থায় যুদ্ধে তিনি মৃত্যুছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারবেন না—এ সব কথা সঞ্জয় বারংবার তাঁর মাতাকে বলেছিলেন। কিন্তু বিদুলার তেজস্বিতাও বাগ্মিতার কাছে পুত্র সঞ্জয়কে হার মানতে হোল। ক্রমে তাঁর মধ্যে সুপ্ত ক্ষাত্রতেজের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে সেই তিরস্কৃত যুবক পরিশেষে নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করে ও মাতাকে আনন্দিত করে ধন্য হন।

পৌরাণিক যুগের সঞ্জয়ের মত মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠিরও যে অতঃপর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও বিজয় লাভ করেন তা আমরা সবাই জানি।

বন পর্বে উদাসীন যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করবার জন্য দ্রৌপদী বৃহস্পতির নীতিশাস্ত্র সম্মত উপদেশ দেন এবং প্রহ্লাদ ও বিরোচনের একটি প্রাচীন উপাখ্যান দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন। দ্রৌপদীর ভাষণটি খ্যাতিলাভ করেছে (ভারবি তাঁর মহাকাব্যে তা অমর করেছেন) কিন্তু তাঁর উপাখ্যানটি চিত্তাকর্ষক হয়নি। কুন্তীর সংক্ষিপ্ত ভাষণ সারগর্ভতো বটেই উপরন্তু তাঁর কথিত উপাখ্যানটি শুধু অধিকতর মূল্যবান-মাত্র নয়—তা বস্তুতঃ নষ্ট স্বাস্থ্য লাভের উৎকৃষ্ট রসায়ণ এবং রত্নাকর মহাভারতের একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এমনভাবে অনুশাসিত করবার যোগ্যতা বীর মাতা কুন্তী ভিন্ন আর কারই বা ছিল? এই নির্বীর্য দেশে দেবী কুন্তী সত্যই প্রাতঃ স্মরণীয়া।

মহাভারতকার নিজে এই গাথার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তিনি এর শেষে ফলশ্রুতিতে বলছেন—"বিজিগীষু রাজা এই 'জয়াখ্য ইতিহাস' পুনঃ পুনঃ পাঠ করবেন। শত্রুপীড়িত রাজাকে

* রামায়ণের যুগেও বীর্যবত্তার জন্য সৌবীর দেশের বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। অরণ্যকাণ্ডে সীতা রাবণকে বলছেন— "সুরাষ্ট্র সৌবীরকয়োর্যদন্তরং তদন্তরং বৈ— তব রাঘবস্য।" অর্থাৎ সুরাষ্ট্র ও সৌবীর দেশের মধ্যে যে পার্থক্য তোমার ও রামচন্দ্রের মধ্যেও সেই প্রভেদ। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে সৌবীর দেশ রামচন্দ্রের উপমান।

হিতার্থী অমাত্য এই অনুশাসন শুনিয়ে সঞ্জীবিত করে তুলবেন। গর্ভিণী এই গাথা শুনলে বীরপুত্র প্রসব করবেন ইত্যাদি। ব্যাসদেব মহাভারতের প্রারম্ভে বলেছেন

ইদং কবিবরৈঃ সর্বৈরাখ্যানমুপজীব্যতে।
উদয় প্রেপ্সুভির্ভৃত্যৈরভিজাত ইবেশ্বরঃ ॥

অর্থাৎ অভিজাত নৃপতিকে যেমন উন্নতিকামী ভৃত্যেরা আশ্রয় করে তেমনই ভাবী কালের প্রধান কবিরা খ্যাতির জন্য এই মহাভারত কাহিনীকে আশ্রয় করবেন। মহাভারত ও রামায়ণ কথা পরবর্তী কবিদের কাছে মুরারি মিশ্রের ভাষায়—'নীবী' বা মূলধন স্বরূপ থাকলেও উদ্‌যোগপর্বের এই প্রাচীন 'জয়াখ্য ইতিহাস' অবলম্বন করে কোন সংস্কৃত কাব্য নাটক রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। একাদশ শতকে মহাকবি ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'ভারত মঞ্জরী'তে চারটি শ্লোকে এই অনুশাসনের চার অধ্যায়ের সারবস্তু সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট করেছেন। তাঁর মঞ্জরী কাব্যে বিদুলার পরিবর্তে বিদুরা নামটি পাঠরূপে গৃহীত হয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা এই যে কাদম্বরী কথায় যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের প্রতি শুকনাসের উপদেশবাণী যাঁদের কণ্ঠস্থ—সংস্কৃত সাহিত্যের সেই রসিক এবং বিদ্বান ব্যক্তিরাও এতাবৎ কাল এই গাথাকে উপেক্ষা করে এসেছেন। দীর্ঘদর্শিনী বিদুলা কেন যে পরবর্তীকালের কবিচিত্তে তথা জনচিত্তে স্থান পান নি তা বাস্তবিকই গবেষণার বিষয়।

বলাবাহুল্য এই অপরূপ গাথাটির রসবস্তু আস্বাদান করতে হলে মূল মহাভারত পড়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কাহিনীর প্রারম্ভেই

যশস্বিনী মন্যুমতী কুলেজাতা বিভাবরী।
বিশ্রুতা রাজসংসৎসু শ্রুতবাক্যা বহুশ্রুতা।

যশস্বিনী, অভিমানিনী, সৎকুলোৎপন্না, কোপনা, সভাগৃহে প্রতিষ্ঠাপন্না, ইতিহাস নিপুণা ও বিদুষী বিদুলার এই বর্ণনায় পাঠক মুগ্ধ হবেন। কালিদাসের নায়িকাদের 'চণ্ডী' বিশেষণটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে কিন্তু কোপনা অর্থে 'বিভাবরী' শব্দটি যেমন অপূর্ব তেমনই অশ্রুতপূর্ব।

বিদুলা পুত্রকে বলছেন,—"রাজহংসী যেমন এক মহাহ্রদ থেকে অন্য বিশাল হ্রদে আগমন করে, আমি তেমনই এক মহাবংশ থেকে তোমাদের উচ্চকুলে এসেছিলাম। আমি রাজ্যেশ্বরী, কল্যাণময়ী এবং স্বর্গত মহারাজের বহুমান ভাজন ছিলাম। হে সঞ্জয়, তুমি যখন তোমার পূজনীয়া মাতা এবং প্রিয় পত্নীকে দীনাতিদীন অবস্থায় ক্রমশঃ দেখতে থাকবে, তোমার সমস্ত যশ ও সৎকীর্তি যখন লুপ্ত হবে, তোমার আচার্য ও ঋত্বিক পুরোহিতেরা, তোমার বিশ্বস্ত ভৃত্য ও একান্ত পরিচারকেরা যখন একেএকে তোমায় ত্যাগ করবে, অর্থীরা সকলে দ্বার থেকে ফিরে যাবে— তখন হে পুত্র, তোমার জীবনে আর প্রয়োজন থাকবে না।"

সিন্ধু সৌবীর দেশ সেকালে অশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই গাথায় বীরযোদ্ধা ও তেজস্বী অশ্বের প্রসঙ্গ এমনভাবে উত্থাপিত হয়েছে যে বক্তব্য তাতে অত্যন্ত জীবন্ত হয়েছে। বিদুলা বলছেন

শত্রুনির্মজ্জতা গ্রাহ্যো জঙ্ঘায়াং প্রপতিষ্যতা।
বিপরিচ্ছিন্নমূলোঽপি ন বিষীদেৎ কথঞ্চন।
উদম্য ধুরমাকর্ষেদাজানেয়কৃতং স্মরণ্ ॥

অর্থাৎ পতনের বা মৃত্যুর সময়েও শত্রুর জঙ্ঘা ধারণ করবে, ভিত্তিচ্যুত হলেও বিষণ্ণ হবে না, অভিজাত অশ্ব এক্ষেত্রে যা করে তুমিও তাই স্মরণ কোর। আজানেয় শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট বা অভিজাত অশ্ব। উপাখ্যানের শেষে কুন্তী বলছেন—

সদশ্ব ইব স ক্ষিপ্তঃ প্রণুন্নোবাক্যসায়কৈঃ।
তচ্চকার তথা সর্বং যথাবদনুশাসনম্ ॥

অর্থাৎ কশাহত উত্তম অশ্বের মত বাক্যবাণ তাড়িত সঞ্জয় তাঁর মাতার আদেশ যথাযথ পালন করেছিলেন। আমাদের মনে রাখা উচিত যে অশ্ব ভিন্ন যোগ্যতর উপমান সেদিন সত্যই দুর্লভ ছিল। তাই রামায়ণ ও মহাভারতে বহুস্থানে এর অত্যন্ত সার্থক ও সুন্দর ব্যবহার দেখি। রামায়ণে পুত্রের আকস্মিক বনগমনবার্তা পেয়ে মহিষী কৌশল্যা যখন মূর্ছিতা হয়ে পড়েছেন এবং রামচন্দ্র তাঁকে আশ্বস্ত করছেন তখন কবি বলছেন

মমার্জ পাণিনা রামঃ বড়বামিব বিহ্বলাম্

যুদ্ধক্ষেত্রে লড়তে লড়তে তেজীয়ান ঘোড়ার মুখ থুবড়ে পড়া যে পাঠকেরা কল্পনা করতে পারবেন এই উপমা শুধু তাঁদেরই জন্য। মহাভারতের বিরাট পর্বে মহিষী সুদেষ্ণা সৈরিন্ধ্রীবেশী দ্রৌপদীকে দেখে বলছেন—'তোমার মত রূপসী আমরা পূর্বে কখনও দেখিনি

তেন তেনৈব সম্পন্না কাশ্মীরী তুরঙ্গমী

নানা সুলক্ষণযুক্ত কাশ্মীর দেশের অশ্বের মত তুমি সুঠাম এবং সুন্দর।' এঁদেরই দৃষ্টান্তে পরবর্তীকালে ক্ষেমেন্দ্র কালিদাসের কবিতার সঙ্গে 'কাম্বোজ তুরগাঙ্গনা' কাম্বোজ দেশের ঘোড়ার তুলনা দিয়েছেন। সুন্দরী নারীর এবং ছন্দোবন্ধ কবিতার এই বিচিত্র উপমান পাঠককে শুধু চমৎকৃত করবে তাই নয়, অশ্বখুর লাঞ্ছিত সেই অতীতের স্মৃতির সৌরভে তাঁর চিত্ত অবশ্যই আবিষ্ট হবে।

মূলগাথায় বিদুলার উক্তিতে শ্লোক সংখ্যা একশো পঁচিশ এবং সঞ্জয়ের উক্তি মোট বারোটি শ্লোক। (সিদ্ধান্ত বাগীশ সংস্করণ) বিদুলার উক্তি থেকে কয়েকটি শ্লোক আমাদের ইচ্ছামত বেছে নিয়ে ও সাজিয়ে ভাবানুবাদের সঙ্গে এইখানে দেওয়া হোল। মহাভারতে ও পুরাণে আঠারো সংখ্যাটি বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। (মহাভারতের পর্ব সংখ্যা ১৮, গীতার অধ্যায় সংখ্যা ১৮, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলে ১৮ দিন, সৈন্যসংখ্যা ১৮ অক্ষৌহিণী মহাপুরাণ সংখ্যা ১৮, উপপুরাণ সংখ্যা ১৮ ইত্যাদি) তাই আমরাও এই সংকলনে শ্লোকসংখ্যা আঠারো রাখলাম। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুকরণে বলি— এ হোল অপরাজিতা সুক্তএর ঋষি কুন্তী এবং ছন্দ অনুষ্টুপ্ ও দেবতা বিজয়। হৃত পৌরুষলাভার্থে, নষ্টরাজ্য প্রাপ্ত্যার্থে এর বিনিয়োগ।

অনন্দন ময়াজাত দ্বিষতাং হর্ষ বর্ধন।
ন ময়া ত্বং ন পিত্রা চ জাতঃ কাভ্যাগতোঽসি ॥ ১ ॥

হে অরিরঞ্জন, তুমি আমার গর্ভজাত হয়েও যথার্থ নন্দন হ'তে পারনি। বোধকরি তুমি তোমার বীর পিতার বা আমার কারও সন্তানই নও। কোথা থেকে তোমার মত অধমের জন্ম হোল ?

উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা সোষ্বেবং পরাজিতঃ।
অমিত্রান্ নন্দয়ন্ সর্বান্ নির্মানো বন্ধুশোকদঃ ॥ ২ ॥

ওঠো কাপুরুষ ওঠো। পরাজিত হয়ে অভিমানকে বিসর্জন দিয়ে শুয়ে থেকো না। ওতে শত্রুর আর বন্ধুর শোক আরও বেড়ে যায়।

মাত্মানমবমন্যস্ব মৈনমল্পেন বীভরঃ।
মনঃ কৃত্বা সুকল্যাণং মাভৈস্ত্বং প্রতিসংহার ॥ ২ ॥

দোহাই তোমার নিজের অপমান সহ্য কোর না। অল্পে সন্তুষ্ট হোয়ো না। মহৎ কল্যাণের চিন্তা কর। অবসাদের অবসান হোক।

সুপূরা বৈ কুনদিকা সুপূরো মূষিকাঞ্জলিঃ।
সুসন্তোষঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনৈব তুষ্যতি ॥ ৪ ॥

সামান্যই জল থাকে ক্ষুদ্র নদীতে, সহজেই পূর্ণ হয় মূষিকের ভাণ্ডার আর যে কাপুরুষ সেও অল্পেই তৃপ্তিলাভ করে।

ইষ্টাপূর্তং হি তে ক্লীব কীর্তিশ্চ সকলা হতা।
বিচ্ছিন্নং ভোগমূলং তে কিং নিমিত্তং হি জীবসি ॥ ৫ ॥

তোমার অতুল কীর্তি লুপ্ত হয়েছে, নিখিল ভোগের মূল রাজ্যকে হেলায় হারিয়েছে, নপুংসকের মত কেন আর তবে বৃথা জীবন বয়ে চলেছে?

পরং বিষ হতে যস্মাত্তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে।
তমাহুর্ব্যর্থনামানং স্ত্রীবদ্ য ইহ জীবতি ॥ ৬ ॥

পরের আক্রমণ যে সহ্য করতে পারে সেই পুরুষ। স্ত্রীলোকের মত যার নামহীন কীর্তিহীন জীবন সেই অসার্থক।

উদ্যচ্ছেদেব ন নমেদুদ্যমোহ্যেব পৌরুষম্।
অপ্যপর্বণি ভজ্যেত ন নমেতেহ কস্যচিৎ ॥ ৭ ॥

উদ্যমের শরণ নাও। উদ্যমই পুরুষকার। অসময়ে ভেঙে চুরমার হও ক্ষতি নেই। অবনতিই জগতে লজ্জার ব্যাপার।

অপ্যাহেরারুজন্ দংষ্ট্রামাশ্বেব নিধনং ব্রজ।
অপি বা সংশয়ং প্রাপ্য জীবিতেঽপি পরাক্রমেঃ ॥ ৮ ॥

ছুটে যাও উপড়ে আনো গে সাপের বিষদাঁত। হোলই বা তৎক্ষণাৎ জীবন সংশয়। তুমি অন্ততঃ তোমার পরাক্রম দেখাও।

অপ্যরেঃ শ্যেনবচ্ছিদ্রং পশ্যেস্ত্বং বিপরিক্রমন্।
বিবদন্ বাথবা তূষ্ণীং ব্যোম্নীবা পরিশঙ্কিতঃ ।। ৯ ।।

বাজপাখী যেমন আকাশে উড়ে বেড়ায় তুমিও তেমনই নির্ভয়ে পৃথিবীর মাটিতে বিচরণ কর। শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ কর।

নিরমর্ষং নিরুৎসাহং নির্বীর্যমরিনন্দনম্।
মাস্ম সীমন্তিনী কাচিজ্জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্ ॥ ১০ ॥

জগতের আর কোনও সীমন্তিনীর গর্ভে যেন তোমার মত ক্রোধহীন নিস্তেজ নির্বীর্য পুত্র না জন্মায়। তুমিই যথার্থ শত্রুকুলের দুলাল।

ত্বমেবং প্রেতবচ্ছেষে কস্মাদ্ বজ্রহতো যথা।
উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা স্বাপ্সীঃ শত্রুনির্জিতঃ ॥ ১১ ॥

প্রেতের মত, বজ্রাহতের মত নিস্তব্ধ থেকো না। ওঠো ভীরু, পরাজিত ওঠো তোমার প্রচণ্ড নিদ্রা ভেঙে।

মাস্তং গমঃ সুকৃপণো বিশ্রূয়স্ব স্বকর্মণা।
মা মধ্যে মা জঘনো ত্বং মাঽধোভূস্তিষ্ঠ গর্জিতঃ ।।১২।।

শোনো কৃপণ, এখন তোমার অস্ত যাবার সময় নয়। মধ্যে নয়, পার্শ্বে নয়, পশ্চাতে নয়, তুমি গর্জন করে সম্মুখে এসে দাঁড়াও। (সাম, দান বা ভেদ নয় দণ্ডই তোমার একমাত্র অবলম্বন—নীলকণ্ঠ দীক্ষিত)

অলাতং তিন্দুকস্যেব মুহূর্তমপি হি জ্বল।
মা তুষাগ্নিরিবানর্চি র্ধূমায়স্ব জিজীবিষুঃ ॥ ১৩ ॥

জীবনে একটিবারও অলাত চক্রের মত দীপ্তশিখায় জ্বলে ওঠো। শিখাহীন তুষানলে অনন্তকাল ধরে ধোঁয়ায় ঢাকা জীবনে লাভ নেই।

মা ধূমায় জ্বলাত্যন্তম্ আক্রম্য জহি শাত্রবান্
জ্বল মূর্ধণ্যমিত্রাণাং মুহূর্তমপি বা ক্ষণম্ ॥ ১৫ ॥

ধোঁয়া নয়, আগুন চাই। ছুটে যাও আক্রমণ কর ধ্বংস কর মুহূর্তকালের জন্যও দূরে ঐ শত্রুর মাথায় চূড়ায় তোমার প্রতাপের জ্বলন্ত ছটা আমাকে দেখতে দাও।

স্বর্গ স্বারোপমং রাজ্যমথবাপ্যমৃতোপমম্
যুদ্ধ মেকায়নং মত্বা পতোল্মুক ইবারিষু ।।১৫।।

স্বর্গের মত অমৃতের মত দুর্লভ রাজসম্পদ শত্রুরা ছিনিয়ে নিয়েছে। যুদ্ধই তোমার একমাত্র পথ। যাও উল্কার মত তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। (হয় স্বর্গ নয় রাজ্য একটি পথ বেছে নাও—নীলকণ্ঠ)

ন শত্রুভবনে পুণ্যে দিবি তদ্ বিদ্যতে সুখম্।
যদমিত্রান্ বশে কৃত্বা ক্ষত্রিয়ঃ সুখমেধতে ।।১৬।।

ক্ষত্রিয় শত্রুজয় করে যে তৃপ্তি যে সুখ ভোগ করেন, জেনো ইন্দ্রের অমরাবতীতেও তা কোনো কালেই নেই।

ইন্দ্রোবৃত্রবধেণেব মহেন্দ্রঃ সমপদ্যত।
মাহেন্দ্রং চ গ্রহং লেভে লোকানাঞ্চে শ্বরোৎ ভবৎ ॥ ১৭ ॥

বাসব যেদিন বৃত্রাসুরকে সংহার করলেন সেদিন থেকে তাঁর নাম হোল মহেন্দ্র। স্বর্গের মহেন্দ্রলোকে তাঁর স্থিতি হোল। ত্রিভুবন লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ের তলায়।

অপারে ভব নঃ পারমপ্লবে ভব নঃ প্লবঃ।
কুরুষ্ব স্থানমস্থানে মৃতান্ সঞ্জীবয়স্ব নঃ ॥ ১৮ ॥

এসো তুমি দুস্তর সাগরে তরণী হয়ে। অকূল থেকে (দেশবাসীকে) নিয়ে চল কূলে। আমাদের ভিত্তিহীন জীবনের তুমি ভিত্তি হও। মৃত্যু থেকে আমাদের জীবনে নিয়ে চল॥

একজন ইংরেজ মনীষীর তাঁর বিখ্যাত আলোচনা গ্রন্থে লিখেছেন

"Heroic Poetry........must have the qualities of simplicity and sincerity, combined with the magnetic power of stirring the heart by showing how men and women can behave when really confronted by danger, death or irremediable misfortune". Sir Alfred Lyall : Studies in Literature and History.

আলেকজাণ্ডার সোমা দ্য করোস

সোমেন বসু

দ্রুত যানবাহনের দিনে আজ কে এমন পাগল আছে যে অন্য দেশ জানবার তাড়ায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পথ হেঁটে চলবে, পার হবে মরুভূমি, খরস্রোতা নদী, তুহিন শীর্ষ পর্বতশৃঙ্গ। কিন্তু এমন মানুষও আছে। যখন সাগর পার হয়ে জাহাজ চলেছে ইউরোপ থেকে এশিয়া, বেষ্টন করে চলেছে আফ্রিকা, যখন নানা জাতের পণ্যব্যবসায়ী ভারত চীন জাপানের বন্দর ভরে ফেলেছে তখন এক পাগল পথচলা পথিক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন সম্পূর্ণ অজানা এক পথে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে। অত্যুচ্চ শৈলমালায় বেষ্টিত সভ্য জগতের সঙ্গে যোগ রহিত হয়ে দিনের পর দিন পড়ে ছিল তিব্বত। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও সভ্যতার অনেকাংশ তিব্বতে আশ্রয় পেয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে রক্ষিত হয়ে আসছিল। সেই তিব্বতী ভাষা শিক্ষা ও আলোচনার পথ সুগম করে তিনি ভাবীকালের পথিকদের পথ চলা সহজ করে দিলেন।

ট্রান্সিলভেনিয়ার একটি শান্ত গ্রাম কোরোসি—১৭৮৪ খৃঃ-এ এপ্রিল মাসে সেই গ্রামে আলেকজাণ্ডার সোমার জন্ম। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর পূর্বপুরুষরা পারদর্শী ছিলেন। বহুকাল ধরে অভূতপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে তাঁরা হাঙ্গারীর দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে তুর্কী আক্রমণ ঠেকিয়েছেন। সোমার পিতার নাম অ্যানড্রু, মার নাম ইলোনা। যে গৃহে তাঁর জন্ম হয়েছিল সে গৃহ আগুনে নষ্ট হয়েছিল। তবে এখন গ্রাম রেজিষ্টারে ১৪৩ নম্বরের বাড়ী সেই মূল বাড়ীর ভস্মাবশেষ ওপরেই গড়ে উঠেছিল।

নিকটাত্মীয় ও বন্ধু জনের সাক্ষ্যেই জানা গেছে যে বালক আলেকজাণ্ডার বুদ্ধির দীপ্তি বহন করতো তার উজ্জ্বল মুখশ্রীতে—কঠিন শক্তি প্রকাশ পেতো লোহ দৃঢ় বাহু এবং বক্ষপটের বিরাট বিস্তারে। গ্রামে স্কুলেই শিক্ষা সুরু হয়েছিল সোমার। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নজ এনিড কলেজে তিনি ভর্তি হলেন। সেখানে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেন প্রফেসার স্যামুয়েল হেগেডাস। বয়সের ব্যবধান পার হয়ে গুরুশিষ্যে গভীর সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হলো। পরবর্তী কালে এই কৃতী ছাত্র সম্বন্ধে হেগেডাস লিখেছিলেন "যে ক্রোধ তাঁকে স্পর্শ করেনি, হঠকারিতা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, নিতান্ত শান্ত ছিল প্রকৃতি, কথা বলতেন অল্প, করুণামাখানো মুখের মধ্যে দরদভরা স্নিগ্ধ দুটি চোখ মানুষটির পরিচয় বহন করতো। বেশভূষায় বিলাস ছিলনা—অল্পে তুষ্ট হতে জানতেন—"সোমা ছিলেন সেই সৌভাগ্যবানদের একজন যাদের বিরুদ্ধে কারো কোন অভিযোগ নেই, যারা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করে না।"

ছাত্রজীবনে গভীর জিজ্ঞাসা ছিল মনে—হাঙ্গারীয় জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে। নানা রাজ্যের ইতিহাস পড়লেন, আরবী ভাষা শিখলেন আর মনে মনে ঠিক করলেন যে সারা জীবন দেশ দেশান্তর ঘুরে খুঁজে বার করতে হবে হাঙ্গারী জাতির পরিচয়। নজ এনিডে বেথলেন কলেজে সোমা কবিতার অধ্যাপক হলেন। অবসর সময়ে টুকরো টুকরো কবিতাও লিখেছেন কিন্তু তা প্রকাশ করার তাগিদ ছিলনা একটুও। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে স্কলারশিপ নিয়ে গটিনজেনে পড়তে গেলেন—সেখানে মোটামুটি শিখে নিলেন ইংরাজী। স্কুল কলেজের পাঠ সম্পূর্ণ চুকিয়ে সোমা যেদিন দেশে ফিরলেন তখনই অধ্যাপক হেগেডিয়াস কাজ দিতে চাইলেন। কিন্তু সোমার মন তখন অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। শ্লাভোনিক ভাষা শেখার উদ্দেশ্যে ক্রোসিয়া যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। হেগেডিয়াস সোমাকে এই যাত্রায় উৎসাহ দেননি বরং বারবার বাধাই দিয়েছেন। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরলেন

সোমার সামনে, পথের বিপদ সংকুলতার কথা বল্লেন—কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত পথিকের যাত্রার পথ বদলালো না। প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে গভীর ঔৎসুক্য তখন তাঁকে প্রাচ্য দেশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় সোমা এসে জানালেন হেগেডিয়াসকে যে পরদিন তিনি যাত্রা সুরু করবেন। সন্ধ্যায় দুজনে ব্যস্ত রইলেন গল্পে হেগেডিয়াস আর বাধা দিলেন না। পরদিন আবার এলেন সোমা—এসে বল্লেন 'তোমায় আর একবার দেখতে এলুম।' দেখে মনে হলো যেন কাছেই কোথাও চলেছেন। দুজনে বেরুলেন পথে। পথের শেষে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সে থেমে গেলন হেগেডিয়াস। সোমা শেষ বিদায় নিয়ে চলে গলেন— যতদূর দেখা গেল হেগেডিয়াস দাঁড়িয়ে রইলেন। পাগল ছাত্রের জন্য বৃদ্ধ শিক্ষকের কি ব্যাকুল উৎকন্ঠা। হেগেডিয়াসের নিজের বিবরণই তুলে দিলাম। Next day that is monday, he again stepped in to my room, lightly clad as if he intended merely taking a walk. He did not even sit down but said "I merely wished to see you once more". We then started along Szentkiralyi road which leads to wards Nagy Szeben. Here in the Country among the fields—we parted for ever. I looked a long time after him as he was approaching the banks of the Maros.

অজানা দেশের উদ্দেশ্যে পথচলার পাথেয় হলো গভীর বিদ্যার্জনের স্পৃহা, মধুর ব্যবহার আর মুখে লেগে থাকা শান্ত অমায়িক হাসি। অসাধারণ ছিল দৈহিক শক্তি তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল মনের জোর। কী দারুণ অভাবের মধ্যে তাঁর দিন কেটেছে তা বলে শেষ করা যায় না। অমায়িক মুখের মধ্যে দৃঢ়চিত্ত মানুষ লুকিয়ে থাকতো—কত বন্ধুর অযাচিত দান তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন—১৮৩৬ সালে হাঙ্গারীর বন্ধুরা তাঁর জন্য টাকা তুলেছিলেন সে টাকাও ফিরিয়ে দিলেন।

১৮১৯ খৃঃ-এ নভেম্বর মাসে সোমা হাঙ্গারীর পার্বত্যসীমানা পার হয়ে চলে গেলেন। ভেবেছিলেন পায়ে চলা পথেই কনষ্টান্টিনোপল পার হয়ে এশিয়ায় ঢুকবেন, অবস্থাবিপর্যয়ে তা সম্ভব না হওয়ায় জাহাজে করে চলে গেলেন মিশরে। যেখানে গেছেন সেখানেই অঞ্জলি ভরে কিছু না কিছু সঞ্চয় করে এনেছেন। মিশরে আরবী শিখলেন—সেখান থেকে সাইপ্রাস, লাটাকিয়া, আলেপ্পো। এখান থেকে পায়ে হেঁটে নৌকোয় ২২শে জুলাই বাগদাদ। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ঘোড়ায় চড়ে বাগদাদ থেকে তেহরাণ যাত্রা করে তেহরাণ পৌঁছলেন ১৪ই অক্টোবর। তেহেরাণে এসে একজনও য়ুরোপীয় চোখে পড়লো না। ইংরাজ দূতাবাসের এক স্থানীয় ভৃত্য অবশ্য যথেষ্ট সমাদরে সোমাকে অভ্যর্থনা করেছিল। তারপর দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা যখন ফিরে এলেন তখন সোমা তাঁদের কাশে তাঁর উদ্দেশ্য জানালেন। দূতাবাসের হেনরী উইলক আর মর্জ উইলক চার মাস তাঁকে তেহরাণে রাখলেন, সেখানে সোমা পারসী শিখলেন ইংরাজীটাও ঝালিয়ে নিলেন পুঁথিপত্র আলোচনার সুযোগ হলো, পার্থিয়াস রাজবংশের রৌপ্যমুদ্রা তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ১লা মার্চ ১৮২১, পারস্য পোষাকে সোমা তেহরাণ ছেড়ে বেরুলেন—নাম হলো সেকেন্দার বেগ। ইংরাজ বন্ধুরা জনসনের ছোট একটা অভিধান দিলেন বন্ধুত্বের স্মারক চিহ্ন হিসেবে। খোরাসান পার হয়ে এলেন বোখরায়, সেখান থেকে তীর্থ যাত্রীর বেশে কাবুল। কাবুল থেকে পেশওয়ার হয়ে নানাপথ ঘুরে কাশ্মীর।

আড়াই বছর পথে পথে কাটিয়ে—জাহাজে নৌকায়, ঘোড়ায়, পায়ে হেঁটে তিনি এলেন ভারতবর্ষে। এই দুর্গম পথে কপর্দকশূন্য অবস্থায় বিদেশীভাষার প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে একলা এসেছেন—হাঙ্গারী জাতির উৎপত্তি সন্ধানে। কাশ্মীর সীমান্তে মুরক্রাফ্‌টের সঙ্গে দেখা—মুরক্রাফ্‌ট্ নূতনের সন্ধানে বেরিয়েছেন। দুই সন্ধানী মনের পরিচয় ঘটলো দূর বিদেশে তুষারাচ্ছন্ন ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রান্তসীমায়। সুদীর্ঘ পথচলার পর সোমা বুঝতে পারছিলেন যে হাঙ্গারী জাতির উৎপত্তির তত্ত্বসন্ধানে আরও পূর্বদেশে যাওয়ায় বিশেষ ফল হবে না। মুরক্রাফ্‌ট্ তাঁর পথ দেখালেন—বল্লেন তিব্বতীভাষা শিখতে—সোমাকে

উপহার দিলেন ফাদার গর্গির 'এলফাবেটান টিবেটানাম'। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত উপকরণ থেকে রোমে ছাপা এই বইখানিই সোমার ভবিষ্যৎ সাধনার প্রথম পাঠ জোগালো।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের তুহিনাবৃত বিরাট ভূখণ্ডে বাস করলেন সোমা—কাশ্মীরের রূপে কতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন জানা নেই—তবে একটি বছর তিনি গর্গির এলফাবেটাম পড়ে কাটিয়ে দিলেন। তিব্বতী ভাষার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করলেন, মনে মনে স্থির করলেন যে তিব্বতী ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে হবে। নতুন সংকল্প জাগা মাত্রই মন স্থির হয়ে গেল। তিব্বতের উচ্চমালভূমিতে যে সম্পদ লুকানো আছে তারই সন্ধানে যাবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সোমার জীবনের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশের সন্ধান দিলেন মিঃ মুরক্রাফ্‌ট্‌। যখন কাশ্মীরের সৌন্দর্য-স্বর্গে সোমা তাঁর পুরোনো সন্ধানের সূত্র সন্ধেও প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন তখন মুরক্রাফ্‌ট্‌ এলেন তাঁর সাহায্যে। অর্থ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে চিঠিপত্র ও পরিচয়পত্র দিয়ে মুরক্রাফ্‌ট্‌ লের প্রধান অফিসার জানাস্কারের লামার কাছে সোমাকে পাঠালেন। ১৮২৩-এর ২রা মে সোমা গেলেন তিব্বতে।

১লা জুন লাডকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুরক্রাফ্‌ট্‌ের চিঠি নিয়ে সোমা হাজির হলেন। প্রধানমন্ত্রী এই দূরাগত জ্ঞানভিক্ষুকে দেখে মুগ্ধ হলেন। সস্নেহে সাদর সম্ভাষণ জানালেন, পত্র দিলেন য়াংলার লামাকে, দিলেন পাশপোর্ট আর দিলেন আট পাউণ্ড চা-পার্বত্য শীতের প্রাধান পাথেয়। ১৮২৪ এর ২২শে অক্টোবর তিনি লাডকের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে জানস্কারে পেঁছলেন। সেখানে লামার সহায়তায় তিব্বতী সাহিত্য পড়া সুরু হলো। তিব্বতের প্রচণ্ড শীতের সংগে সোমার পরিচয় ছিলনা। ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশী সেখানকার শীত। অপেক্ষাকৃত উষ্ণত দিনেও তুষারে ছেয়ে যেত ভূমি, শস্য চাপা পড়ে যেত সেই তুষারের আচ্ছাদনে। পুরো চার মাস তিন ফুট চওড়া আর তিন ফুট লম্বা একটা ঘরের মধ্যে শিক্ষার তপস্যায় সোমার কাটলো, আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা নেই, আলো জ্বললো রাতে কঠিন মাটিই হলো শয্যা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত তাঁর পড়ার সময়। এই সময় নিজের শিক্ষার সম্বন্ধে তিনি লিখছেন যে লামার সাহায্যে তিনি তিব্বতী ভাষার ব্যাকরণগত গঠন আয়ত্ত করেছিলেন এবং তিব্বতী সাহিত্যের মূল ঐশ্বর্য তিনশো কুড়িটি গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। শীতকালে যখন শীতের প্রাবল্য সব রকম অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে গেল তখন লামার সংগে পরামর্শ করে সোমা দক্ষিণে চলে এলেন। তুষারপাত বন্ধ হবার আগেই তিনি কুলু উপত্যকায় চলে এলেন। ২৬শে নভেম্বর তিনি স্যাবাথুতে এসে পেঁছলেন। দুর্গম পথ তুষারপাতে দুর্গমতর হওয়ায় লামা আর এলেন না।

ভারত সীমান্তে স্যাবাথু নানক স্থানে সোমা যখন এসে পেঁছলেন তখন সেখানে প্রান্ত রক্ষীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো—এ কোন এক অপ্রত্যাশিত আপদ তাদের শান্ত গতানুগতিক জীবনে বিঘ্ন ঘটায়। ভারপ্রাপ্ত অফিসার আম্বালার পলিটিকাল এজেন্টকে জানালেন যে এক অপরিচিত পথিক যার নাম সোমা দ্য করোস হঠাৎ এসে পেঁছেছে— কি করি তাকে নিয়ে। ব্যাপার গড়ালো কলকাতা পর্যন্ত— উত্তর এলো— গভর্ণর জেনারেলের কাছ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই অপরিচিত অতিথিকে আটকে রাখো। লর্ড আমহার্ষ্ট সোমার কাছে এক বিস্তৃত বিবৃতি দাবী করলেন। মুরক্রাফ্‌ট্‌ের পত্র যে যথেষ্ট হবে না একথা সোমা একেবারেই ভাবেন নি। তিনি উত্তরে আমহার্ষ্টকে জানাচ্ছিন—

After my arrival at this place, not withstanding the kind reception and civil treatment with which I was honoured I passed my time although in much doubt as to a favourable answer from Government to your report, yet with great tranquility till 23rd inst, when on your communication of the government's resolution on the report of my arrival I was deeply affected and not little trouble in mind, fearing that I was likely to be frustrated in my expectations.

পঞ্জাবে রণজিৎ সিংয়ের প্রবল প্রতাপ এবং রুশ সরকারের গুপ্তচরদের গোপন আনাগোনায় ইংরাজ সরকার তখন সীমান্ত প্রবেশের আইন কানুন বেশ জটিল করে তুলেছে, তারই চাপে সোমা আটকে গেলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সোমাকে জানালেন সরকার যে ভাষার কাজে গবেষণা চালাবার জন্য তাঁকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া হবে। কৃতজ্ঞচিত্ত সোমা উত্তরে জানালেন যে তিব্বতী ভাষার একটি সম্পূর্ণ ব্যাকরণ, তিব্বতী-ইংরাজী অভিধান, তিব্বতী সাহিত্যের ইতিহাস তিনি রচনা করার প্রতিশ্রুতি তিনি দিচ্ছেন। এই সময়ই তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন যে সোমা যেমন করে তিব্বতী ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন এমন করে আর কোন য়ুরোপীয় পারেন নি।

১৮২৫ সালের জুন মাসে সোমা আবার চঞ্চল তিব্বতে। প্রথমবারের যাত্রায় আশানুরূপ ফল হয়নি। বনের মধ্য দিয়ে ভেড়াদের পথ ধরে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে সোমা প্রথমে পেঁছলেন সিমলায়। আজকের রাজপুরুষদের গ্রীষ্মাবকাশ সিমলার সৌদিন নিতান্ত দৈন্য দশা—আজকের মত তার না ছিল রূপ না ছিল জৌলুষ। সেখান থেকে কোটগড় হয়ে তিব্বতের গভীরে। যখন এই দুর্গম পথ পার হয়ে তিনি জানাস্কারে পেঁছলেন, তখন দেখলেন সেই লামা অন্যকাজে বেরিয়েছেন তিব্বতের অন্য অঞ্চলে। তিনি ফেরবার পর সোমার সঙ্গে কাজ করতে রাজী হলেন। নভেম্বর থেকে সোমার কাজ সুরু হলো আবার। জ্যোতির্বিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করতে লাগলেন। প্রাণ মন একাগ্র করে কাজে ঢেলে দিলেন। তিব্বতে নেপালে নানা অঞ্চল ঘুরে লামা সেই সব দেশের সম্বন্ধে নানা জ্ঞানের অধিকারী হলেন। ৫২ বছরের সেই লামা স্থানীয় রাজার বিধবা রাণীকে বিয়ে করেন। সোমার প্রতি তাঁর ভালবাসার অন্ত ছিলনা। দূরাগত এই পথিককে জ্ঞানী পণ্ডিত ভালবেসেছিলেন। ঘরছাড়া এই তপস্যারত মানুষ-টির প্রতি তার ছিল আন্তরিক মমতা। কিন্তু মাঝে মাঝে সোমার তাড়ায় আর তাগাদায় তিনিও পাগল হয়ে উঠতেন। সোমার সঙ্গে তাল রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। তিব্বতী অভিধানের বহু শব্দের অর্থ ও ইতিহাস তিনি সোমাকে জুগিয়ে দিলেন। চলিত অচলিত সহজ কঠিন বহু সহস্র শব্দের হিসাব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে বৌদ্ধ লামা একদিন তাঁর পাগল ছাত্রকে ছেড়ে গেলেন। অন্য শিক্ষকের সন্ধান করলেন সোমা। কিন্তু সেই কঠিন পার্বত্য শীতের দেশে নিঃসহায় নিঃসম্বল সোমার সাহায্যে কেউই এগিয়ে এলো না। ভগ্নহৃদয়ে আবার তাঁকে ফিরে আসতে হলো ভারতবর্ষে অসমাপ্ত কাজের বোঝা নিয়ে।

ফিরে এসে নিজের কাজের যে রিপোর্ট দিলেন তা তাঁর আন্তরিক সততার পরিচয় দেয়। সহজেই বলতে পারতেন যে অনেক কাজ করেছেন অনেক সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানালেন —"I think it sufficient to state that I was disappointed in my intentions by the indolence and negligence of that Lama to whom I returned, I could not finish my planned works as I proposed and promised. I have lost my time and cost.

তিনি যে অর্থ নিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে পারছেন না এই চিন্তা তাঁকে কেবলই পীড়িত করেছে। তিনি যা কিছু সংগ্রহ করেছেন সবই সরকারের হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন। কঠিন দুঃখকষ্টের তাঁর আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হয়নি। তাই রিপোর্টে তিনি বললেন "I never meant to take money, under whatever form, for the editing of my works . . . thy honour is dearer to me than the making as they say of my fortune."

দুঃখকে তিনি দুঃখ বলে মনে করেন নি। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত অনিশ্চয়তা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। আবার তিব্বত যাবার সুযোগ যদি না আসে তা হলে কেমন করে ঐ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত

হবে। কানাম মাঠের বলিরামের কাছে যে পুথি দেখে এলেন তার কি হবে, তখনকার একটি চিঠিতে **লিখছেন** "uncertainty and fluctuation is the most cruel and oppressive thing for a feeling heart."

তারপর একদিন তাঁর দ্বিধাশংকিত চিত্তের উদ্বেগ ঘুচিয়ে এল সরকারী আদেশপত্র তাতে আরও তিনবছর তাঁকে তিব্বতে গিয়ে পড়াশুনা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেবার হুকুম হলো। সেই আদেশপত্র ১০ই সেপ্টেম্বরের ১৮২৭ সরকারী গেজেটে ছাপা হলো।

"The Governor General was pleased to allow Csoma de Koros leave to proceed to upper Besarh for a period of those years, for the purpose and on conditions specified in his letter of the 5th of May and that his lordship had given authority to pay that gentleman fifty rupees a month for his support and perhaps enable him to purchase Tibetan manuscripts.

তৃতীয় বারের জন্য সোমা গেলেন তিব্বতে। যে দেশ থেকে দুবার তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছে—আবার এলেন সেই দেশে। আবার সিমলা হয়ে কোটাগড়ের পথ ধরে শতদ্রু নদীর উপত্যকা দিয়ে তিনি চলতে চলতে কানুমে এসে পেঁাছলেন। কানুমের সংঘারামের সেই কঠিন শীতে কেমন করে দিনের পর দিন কাটিয়ে তিনি একা কাজ করেছিলেন সে খবর পৃথিবীর কাছে চিরদিনই অজানা থাকতো। কিন্তু এই সময় ডাঃ গেরার্ড নামে এক চিকিৎসক গেলেন তিব্বতে টীকা দেবার জন্য। ১৮২৯ সালের ৯ই জুলাইয়ে গভর্ণমেন্ট গেজেটে গেরার্ডের ভ্রমণ বিবরণ বেরুলো—তার মধ্যে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তিনি এই আত্মনিমগ্ন সাধকের কথা লিখেছেন।

একটি ছোট্ট ঘরে চতুর্দিকে স্তূপীকৃত পুস্তকের মধ্যে সেই আত্মভোলা সাধককে ডাঃ গেরার্ড খুঁজে পেলেন। প্রচন্ড শীতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পশমের জামায় ঢেকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সোমা কাজ করে যান—বিরাম নেই। মাঝে মাঝে মাখন দেওয়া চা খান। তিব্বতী ভাষায় তাঁর জ্ঞান তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। লামার সাহায্য না নিয়েই কাজ করে চলেছেন। বাইরের জগতের সুখদুঃখ হাসি-কান্নার উর্ধে উঠে তিনি মনোনিবেশ করেছেন নিজের সাধনায় একান্তভাবে। পৃথিবীর কাছে তিনি যে এক বিরাট জ্ঞানভান্ডার খুলে দিতে পারবেন এই মনে করেই তিনি খুসী। ডাঃ গেরার্ড জানাচ্ছেন যে সোমা লামাকে দিতেন পঁচিশ টাকা, চাকর পেতো পাঁচ টাকা। বাকী কুড়ি টাকায় খাওয়া আর বই কেনা প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষ দুশো মাইল দূরে ভারত সীমান্ত থেকে আনতে হয়। সমুদ্র থেকে সাড়ে ন-হাজার ফুট উপরে কানুমে সোমার ঘর। দূরে কাছে বৌদ্ধ মঠগুলিতে সারা দিন সারা রাত গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যায়। সন্ধ্যার বিষণ্ণ আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সেই বিদেশী পান্থ শুনতে পান এই ঘন তুষারাচ্ছন্ন গিরিবক্ষ থেকে হৃদয় মন্থন করা ধ্বনি 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।' সারা জগতের কর্মস্রোতে বিস্মৃত গৃহপলাতক এই শিশুচিত্ত কোন দুরধিগম্যকে লাভ করার আশায় প্রাণে মনে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করে। বিরাট পেটা ঘন্টায় আঘাত পড়ে, সারা পাহাড়ের গা বেয়ে সেই ধ্বনি মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে মিলে যায়।

সোমার কাজের একটা বড় বাধা ছিল তিব্বতী লামাদের গোঁড়ামী। ফলে পুথিপত্র পেতে দেরী হতো। প্রথম ভারত প্রবেশের সময় স্যাবাথুতে যে তাঁকে গুপ্তচর সন্দেহ করা হয়েছিল এ কথা তিনি ভোলেন নি। তাই ডাঃ গেরার্ডের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য গ্রহণ তিনি করেন নি। শিশুর মতন সহজ সারল্যে তাঁর প্রতি বিশ্বের অনাদর সম্পর্কে মনে অভিমান পোষণ করতেন—সঙ্গে সঙ্গে এও বলতেন যে আর অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মূল্য সবাই বুঝবে। তাঁর স্বভাবচরিত্র নিয়ে পাছে কখনো কেউ কিছু বলে এই সঙ্কোচে অসুস্থ বোধ করলেও তিনি স্থানীয় আঙ্গুরের রস কখনো পান করতেন না। দুর্গম হিমারণ্যে বইয়ের অভাব প্রবলভাবে অনুভব করতেন। এসিয়াটিক সোসাইটির নীরবতায়

মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সুদীর্ঘকাল কষ্ট করার পর এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে পঞ্চাশ টাকা করে সাহায্য দিতে রাজী হলো। তিনি এই চিঠিতে লিখলেন "আপনাদের সহায়তা গ্রহণ না করতে আমায় অনুমতি দিন। ১৮২৩ সালে মুরক্রাফ্‌ট্‌ আমার হয়ে আপনাদের কাছে কিছু প্রয়োজনীয় বই চেয়েছিলেন। সে সব আজও পাইনি। ছ বছর ধরে আমার প্রতি আপনারা ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। এখন এই অবস্থায় আমার আর কোন বই চাইনা।" প্রকৃত ঘটনা সোমার কাছে পেঁাছায় নি। ডাঃ গেরার্ড এবং ক্যাপ্টেন কেনেডি সোমার কথা ক্রমাগতই কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেছেন।

১৮৩০ এর শীতকাল পর্যন্ত সোমা ছিলেন কানুমে। তাঁর সুদীর্ঘ পরিশ্রমের প্রথম ফলসম্ভার নিয়ে তিনি কলকাতায় এলেন ১৮৩১-এ। তদানীন্তন লর্ড বেন্টিক গুণাগ্রাহী লোক ছিলেন। সোমার বেতন তিনি দ্বিগুণ করে দিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে ঐ বেতনেই সরকার সোমাকে সোসাইটির কাজে লাগালেন।

১৮৩৩ সালে হোরেস হেম্যান উইলসন চলে গেলেন ইংলন্ড। সুদীর্ঘকাল দূর থেকে তিনি সোমার কাজ ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ করেছেন। তিনি চলে যাবার পর এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী হয়ে এলেন জেমস প্রিন্সেপ। প্রিন্সেপ গভীর অনুরাগে সোমার বইগুলি ছাপার কাজে লাগলেন। বৃটিশ সরকারকে এক সুদীর্ঘ পত্রে তিনি জানালেন যে এই বইগুলি ছাপাতে যা খরচ হবে তা বইগুলির গুরুত্বের তুলনায় কিছুই নয়—তিনি নিজেই প্রুফ দেখার দায়িত্ব নিলেন। তখনকার দিনের পন্ডিতমহলে সোমার নাম ছড়িয়ে গেছে। প্রধানতঃ প্রিন্সেপের চেষ্টাতেই সোমা এসিয়াটিক সোসাইটির অনারারী সভ্য হলেন। এছাড়া দেশবিদেশের নানা সম্মান কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি কেবলই বলতেন কাজ করার আনন্দ ছাড়া আর কোন পুরস্কারে তাঁর প্রয়োজন নেই।

১৮৩৭ সালে সোমার তিব্বতী অভিধান ও ব্যাকরণ ছাপা হয়ে বেরুল। সেই বইদুটি বিতরণ ও বিক্রয়ের ভারও নিলেন প্রিন্সেপ। ভূমিকায় তিনি নিজেকে তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্যের দীন ছাত্র বলে পরিচিত করেছেন। ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত তিনি কলকাতায় রয়ে গেলেন। বুঝলেন সংস্কৃত না জানলে ভাষাতত্ত্ব শেখার অনেকটাই বাকী রয়ে যাবে। ফলে তিনি ঠিক করলেন যে সংস্কৃত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলাও শিখবেন। ভারত সরকারের কাছে তিনি দুটি পাসপোর্ট পেলেন—তার একটি পারসী ভাষায় লেখা, নাম "মোল্লা এসকান্দার সোমা অজ মুলক ই রুম।"

তারপর বাংলা দেশের নানা জেলায় তাঁর অদম্য অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন—মালদহ, কিসেনগঞ্জ, জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়িতে মেজর লয়েড সরকারী বাসভবনে স্থান দিতে চাইলে সোমা তা অস্বীকার করলেন। মেজর লয়েড লিখছেন—

He (cooma) would not remain in my house as he thought his eating and living with me would cause him to be deprived of the familiarity and society of natives with whom it was his wish to be colloquially intimate. I therefore got him a Common native hut and made it as comfortable as I could for him.

বাংলার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বাংলা সংস্কৃত আয়ত্ত করলেন। তারপর ১৮৩৭ সালে কলকাতায় ফিরে এলেন এসিয়াটিক সোসাইটির সহ-গ্রন্থাগারিক হয়ে। জীবনযাত্রার সেই সরলমান একটুও বদলায়নি। চারিদিকে বই ছড়িয়ে মধ্যে পড়াশুনায় ডুবে থাকতেন—মাদুরে শুতেন। দরজা বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখতেন পাছে অধ্যয়নে বাধা হয়।

কিন্তু শান্ত পরিতৃপ্ত জীবন ধাতে সইবে কেন—দূর মঙ্গোলিয়ার স্বপ্ন তখনও চোখে। মনের ভিতরে সেই বরফ ঢাকা শৈলশৃঙ্গের আহ্বান আসে— মনে হয় আরও কত অজানা পুঁথি ছড়িয়ে আছে, কটাই বা উদ্ধার করা গেল। অর্থ যশ, সম্মান সব তাঁর কাছে বোঝার মত। সব পিছনে ফেলে সেই

নির্বাসনের জীবনে যাবার চেষ্টা চললো আবার। তখন তাঁর আটষট্টি বছর বয়স। শরীর ভেঙ্গে পড়ার মুখে। বই কাগজ পত্র যা ছিল সব সোসাইটিকে দিয়ে গেলেন— যদি আর না ফেরেন।

আবার চলা সুরু হলো—৬ই এপ্রিল ১৮৪২ দার্জিলিং পৌছলেন। আর্চিবল্ড ক্যাম্বেল তখন দার্জিলিঙের পলিটিকাল এজেন্ট। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে সোমা প্রায়ই বলতেন — what would Hodgson, Turnour and some of the philosophers of Europe had not given to be in my place when I get to Lasha.

সিকিম যাবার ইচ্ছা ছিল। সিকিমের রাজা তখন দার্জিলিঙে। তাঁর প্রতিনিধির সঙ্গে লাসা যাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করতে সোমা কথা বললেন। রাজপ্রতিনিধি সোমাকে দেখে হতবাক। তাঁরই মত সহজ তিব্বতী ভাষায় অনর্গল কথা বলে এই বিদেশী। তিব্বতী সাহিত্যের বহু অজানা খবর তার নখাগ্রে। ব্যবস্থা আয়োজন সবই হতো। কিন্তু শেষ আহ্বান এসে গেল তাঁর। অল্পদিনের জ্বরে হঠাৎ সোমা মারা গেলেন। ঘন দেওদার সারির মধ্যে, যেখান থেকে দূরের সূর্যালোকদীপ্ত শৈলশৃঙ্গ দেখা যায়, সেই দার্জিলিঙের সমাধিক্ষেত্রে তাঁর দেহ রক্ষিত হল। সুদূর হাঙ্গেরি থেকে পথচলা পথিক একদিন জানবার আকর্ষণে বেরিয়ে পড়েছিলেন আশ্রয় পেলেন পাহাড়ের কোলে। তারপর কত পথিক ঐ দুর্গম পথে গেছে, নানা জ্ঞানের রত্ন আহরণ করে এনেছে। কিন্তু যে নামের পরিচিতি নেই, সাধারণের কাছে যে নামের মূল্য নেই, ঘন পার্বত্যফুলের রাশি অতি সন্তর্পণে সে নামটি ঢেকে রেখেছে। মেঘঢাকা কোন বিষণ্ণ দিনে অকস্মাৎ যদি কোন পথিকের চোখে পড়ে তাকে জিজ্ঞাসু করে তোলে। জীবনের সকল লোভ জয় করে দুর্গম পর্বতের জেলখানায় স্বেচ্ছাবন্দী থেকে সোমা একটি অপরিচিত ভাষাকে জ্ঞানোৎসাহীদের কাছে সহজলভ্য করে দিয়ে গেলেন। আজ একশো বছর পরে আমাদের প্রণাম কি তাঁর কাছে পৌঁছবে।

সমাজ উন্নয়নে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা

পবিত্র পাল

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কি—এটা সংক্ষেপে আগে জেনে নিলে আলোচনার পক্ষে সুবিধে হবে। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করেন। এ ৮৫ ভাগ লোকের মধ্যে বেশীর ভাগই কৃষিকাজ করে থাকেন। কৃষিকাজ যারা করেন তাদের সবার জমি আছে এমন ত নয়ই, বরং জমিহীন কৃষকের সংখ্যাই বেশি। এই শ্রেণীর আর্থিক, সামাজিক এবং অন্যান্য অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কৃষিকাজ যারা করেন না। এমন কিছু লোক টুকটাক শিল্পকর্ম, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক কর্ম ইত্যাদি করে থাকেন। শতকরা ৮৫ ভাগ যেখানে বাস করেন, সেই গ্রামের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান প্রত্যেকেরই আছে। কারো জ্ঞান পুঁথিগত, কারো বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আয়ত্ত। যেভাবেই সে জ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকুক না কেন, এ জ্ঞানটা সবারই মূলতঃ এরকম ঃ ভারতবর্ষের গ্রামবাসী গরীব, অশিক্ষিত, উচ্চাশাহীন, কিছু পয়সাকড়ি যাদের আছে যেমন মহাজন বা ধনী জমির মালিক এমন লোকের দ্বারা তারা পীড়িত, অত্যাচারিত। রাস্তাঘাটের অবস্থা গ্রামে অত্যন্ত শোচনীয়, স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিদারুণভাবে অমানবিক। শিল্পকরণের ফলে জগতের নানাপ্রান্তে যে সাহারিকতার উদ্ভব, মারণধর্মী যে অস্ত্রনির্মাণের মহড়া চলছে, ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে সবাই যে মদমত্ত এ সমস্ত খবর জানার সৌভাগ্য সে গ্রামবাসীদের নেই। তারা সরল, গতানুগতিক জীবনধারা অনুসরণে তাদের ক্লান্তি নেই, বরং শান্তি আছে। চলমান অবস্থার বাইরে যেতে বললে তারা ভীত হয়ে পড়েন। ধর্মীয় কুসংস্কারে তাদের সারা শরীর এমনভাবে বাধা যে তারা সেবন্ধনে থেকে ভিন্নতর জগতের কল্পনা করার সুযোগই পায় না। এম্নি বিভিন্নভাবে সে অবস্থা বলা যায়। মোট কথা—ভারতের গ্রামের ও গ্রামবাসীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। শুধু শোচনীয় বললে সবটা বলা হয় না। যদি বলি অমানবিক বাধাবন্ধনের শৃঙ্খলে মুখ থুবড়ে তারা মৃতবৎ পড়ে আছেন, তবে উপলব্ধির মধ্যে যেন কোথায় একটা ভিৎ খুঁজে পাওয়া যায়।

দু'দুটো যুদ্ধ ইতিমধ্যে হয়ে গিয়ে অনেক কিছু ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। উপরের উপলব্ধির মধ্যে আরেকটা সংযুক্তি এসে ভীড় করেছে। যেমন, গ্রামবাসীদের কানে খবর পৌঁছেছে বহির্জগতের। বহির্জগতের এক নূতন সভ্যতা—শাহারিক সভ্যতা—গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টির অগোচরে। এ শাহারিক সভ্যতা জমকালো সভ্যতা। নানা রকম আমোদ প্রমোদের উপকরণ তাদের আকৃষ্ট করেছে। শিক্ষা সম্পর্কে খানিকটা আগ্রহ দেখা দিয়েছে। জমিজমা এবং খেটে-খুটে খাওয়া সম্পর্কে কৃষিজীবী গ্রামবাসীদের মধ্যে নতুন মূল্যবোধের সঞ্চার করেছে। যে মূল্যবোধে তারা জেনেছেন, খেটেখুটে খাওয়া কাজ ভদ্রলোকের কাজ নয়। অনেকেই চেষ্টা করতে লাগলেন ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে। স্কুল পেরিয়ে মহকুমার কলেজে। চেষ্টা করতে লাগলেই তাদের ইচ্ছে পূর্ণ হয় না। আর্থিক অবস্থা এমনই তাদের যে বইয়ের কথা ভাবা সেখানে হিমালয়ে রেল লাইন বসানোর মত।

জমিজমা সম্পর্কে নতুন মূল্যবোধের ফলে, যারা স্কুলের দরজায় গিয়েছে তারা কোনরকমে পিওনের চাকরী বা শিল্পাঞ্চলে গিয়ে শ্রমিকের চাকরী, যারা স্কুল পেরিয়েছে বা কলেজ পর্যন্ত ধাওয়া করেছে তারা কেরানীর চাকরী নিয়ে সহরেই মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে চায়।

ফলে হয়েছে, জমিজমার দিকে বাপ পিতামহ যে আন্তরিকতা, সারাজীবনের সর্বস্বপণ ছিল তা আর নূতন শ্রেণীর মধ্যে রইল না। এরজন্যে জমির উৎকৃষ্ট চাষ ব্যবস্থা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে লাগল। পতিত জমি বাড়তে লাগল। কৃষি ব্যবস্থার অধোগতি হতে লাগল।

তাহলে দাঁড়াল কি? শহরিকতার দিকে লোভ গেল। স্কুল কলেজ পর্যন্ত দৌড়াবার ভাবনা হল প্রবল। কিন্তু আর্থিক অবস্থা ও যথেষ্ট স্কুল কলেজ না হওয়ার দরুণ ভাবনা আর সার্থকতা পায় না। জমি-জমার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগল। চাষ ব্যবস্থা এবং তদ্‌গত উৎপাদন ব্যবস্থা দিন দিন অবনতির মুখে ধাওয়াকরতে লাগল। তারপর জমিজমা ভাগাভাগির ব্যাপারত রয়েছেই। কৃষি ব্যবস্থার ওপর জমি ভাগাভাগির কুফল যে অনেকটা তা অনেকের জানা আছে। শহরিকতার খবর পেয়েছেন, কিন্তু স্বাদ পাননি গ্রামবাসীরা। স্বাদ বলতে বুঝি, উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা, চলমান বিশ্বজীবন সম্পর্কে খানিকটা খবরাখবর, স্বাতন্ত্র্যবোধ, আধুনিক জীবনবোধে পাঠ নেওয়া, জীবনযাত্রা পদ্ধতির মধ্যে শৃঙ্খলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

সংক্ষেপে এই অবস্থা।

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে গান্ধিজী সেবাগ্রামে ও রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে গ্রাম পরিকল্পনার পেছনে যথেষ্ট ধ্যানধারনা খাটিয়েছিলেন। গুটিকয়েক শহরের জৌলুষে গ্রামের দিকে লোকের নজর কীরকম অবজ্ঞা ও ঘৃণায় পোষাক পরেছিল, এখবর তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাবের কার্ণাল জেলার নিলোখেরী গ্রামে ৬০০০ পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের নিয়ে কলোনী স্থাপন করে স্বাবলম্বনের গবেষণা করেছিলেন এখন যিনি কেন্দ্রীয় সমাজ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব এস. কে. দে। সে সময় তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ইলেকট্রিকেল ও ম্যাকানিকেল ইঞ্জিনিয়ার। কৃষি ও নানাবিধ কর্মে এই ৬০০০ উদ্বাস্তুদের লাগিয়ে দিয়ে স্বালম্বনের রাস্তা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর দিল্লীর কাছে ফরিদাবাদে একই ধরণের সফল চেষ্টা করেছিলেন উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উদ্বাস্তুদের নিয়ে সুধীর ঘোষ। উত্তর প্রদেশের এটাওয়া জেলায় একজন আমেরিকান টাউন প্ল্যানার আলবার্ট মেয়ার ৯৭টি গ্রাম নিয়ে গ্রাম উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। মেয়ার সাহেব এটাওয়া পরিকল্পনায় অনেকখানি সফল হয়েছিলেন।

পরিকল্পনা কমিশন উপরের আদর্শ গ্রাম গঠনের চেষ্টাকে জাতীয় রূপ দেবার কথা ভাবলেন। গ্রামের যে চিত্র উপরে পাওয়া গেছে, তার পরিবর্ত্তনের জন্যে পরিকল্পনা কমিশন সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেন। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, ভারতবর্ষে যা কিছু পরিকল্পনা করা হোক না কেন তাতে সফলতা কখনোই আয়ত্ত হবে না যদি না ভারতবর্ষের বিরাট জনসংখ্যার যে বিশাল অংশ গ্রামে বাস করে তাদেরকে ক্রমশঃ শিক্ষিত, সচেতন ও কাজে লাগাবার উপযোগী করে তৈরী করা যায়। পরিকল্পনাকে তাদের একান্ত আপনার জিনিষ করে গড়ে তুলবার জন্যে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা দরকার। তাদের দিয়েই কাজ করিয়ে তাদের নিজেদের জিনিষ বলেই গ্রহণ করাতে হবে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ—

(ক) গ্রামে কৃষি উৎপাদন যাতে বাড়ে, তার ব্যবস্থা করা।
(খ) গ্রামে রাস্তাঘাট ব্যবস্থার উন্নতি করা।
(গ) গ্রামে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি করা।
(ঘ) গ্রামে শিক্ষাপ্রসারের সুপ্রচুর ব্যবস্থা করা।
(ঙ) জীবনযাত্রা পদ্ধতির মধ্যে শৃঙ্খলা আনা।
(চ) আর্থিক ও সামাজিক জীবনধারার সশৃঙ্খল পরিবর্তন সাধন।
(ছ) মহিলা সমিতি গঠন, লাইব্রেরী গঠন, যুবসমিতি তৈরী করে গ্রামবাসীদের একটা সাংস্কৃতিক

তৎপরতার ভাব সৃষ্টি করে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আনা।
(জ) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা।
সংক্ষেপে এই হচ্ছে উদ্দেশ্য।

পরিকল্পনা ব্যাপারটাই হচ্ছে সামাজিক আচরণকে নিয়মসংযমে নিয়ন্ত্রিত করার। সরানো অগোছালো অনেক মালমশলা পড়ে থাকলেই পরিকল্পনার সাফল্যের সম্ভাবনা আঁচরেই ভিং পায়না। মনুষ্য আচরণের যে ভিতের ওপর সামাজিক আচরণ খাড়া রয়েছে, তার পেছনে যুগযুগ কালের প্রভাব থাকে। ভারতবর্ষের সামাজিক আচরণের পরিবর্তনের যে হার লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা সময়ের তুলনায় অনেক বেশি শ্লথগতি। দুচারটা শহরের বুকে বসে যারা বিশ্বজগতের নানা প্রান্তের সভ্যতার খবরে নিজেদের আচরণের মধ্যে যুক্তির সন্ধান করেন, তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অত্যন্ত কম, প্রধানতঃ কয়েকটি কারণেই।

প্রথমতঃ, শিক্ষার আধুনিকতম চেহারায় আমাদের মনকে ভুলিয়ে রাখি, কিন্তু জীবনচর্চার বাস্তবপ্রয়োগক্ষেত্রে তার কতখানি কার্যকরিতা আছে, তা বুঝবার জন্যে শক্ত ভিৎযুক্ত হৃদয়ের প্রস্তুতি ঘটাই নে।

দ্বিতীয়তঃ, গতানুগতিক জীবনযাত্রাপ্রণালীর মধ্যে অনেক রকম ত্রুটিবিচ্যুতির ছাপ দেখেও সে ত্রুটিবিচ্যুতির সংশোধনে যে পরিমাণ সাহস দরকার সে সাহস অনেকেরই নেই। আত্মীয়বান্ধবের রক্ত চোখগুলো, বাবা-মার প্রতি আবেগগত ভক্তির থেকে উৎসারিত দুর্বলতা এগুলো এঁড়িয়ে ঠিক যুক্তির দিকে পা বাড়ানো অসুবিধে হয়ে ওঠে।

তৃতীয়তঃ, ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে ন্যায়কে ন্যায় ও অন্যায়কে অন্যায় বলে মনে করতে আমরা আপাত ভুল না করলেও, বিশ্বাস সেরকম দৃঢ়তা পায় না সে ন্যায়ের অনুসরণে ও অন্যায়ের প্রত্যাখানে। কারণ, আত্মবিশ্বাসের অভাব।

এ সমস্ত কারণে শহরবাসীরাও নিজেদের জীবনাচরণে গোঁজামিলের চর্চা করে যাচ্ছেন। যেমন, পণপ্রথার ব্যাপারে। পূজার্চ্চনার ব্যাপারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ব্যবহারে। শহরবাসীদেরই যখন এ অবস্থা তখন গ্রামবাসীদের দিকটা একবার ভাবুন। কথাটা দাঁড়াচ্ছে, পরিকল্পনার সফল হওয়ার ব্যাপারে সামাজিক আচরণের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। কথাটা আরো একটু বিশদ করে বলা যাক। যে কোন দেশের পরিকল্পনা যদি এরকম হয়, যে পরিকল্পনা রচনাকারীরা দেশের চালু সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা স্বীকার করে নিয়েছেন তবে পরিকল্পনা সেরকম করতে হবে। কিন্তু পরিবর্তনমানতা যদি তারা গ্রহণ করেন তবে সামাজিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। সেখানে সামাজিক আচরণের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন এসে যায়।

যাদের জন্যে পরিকল্পনা, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের অর্থনীতি, তাদের পারিবারিক সংগঠন ইত্যাদি সব কিছুই বিচার করে নিতে হবে। জনসাধারণের সমস্ত কিছু, এমন একটা পর্যায়ে আছে, সেখানে আধুনিকতম পরিকল্পনা কীরকম প্রতিক্রিয়া জাগাবে, সেখানে সামাজিক নিয়মকানুনের শত-সহস্র জটিলতা কুটিলতা কীরকম সাপের মত ফণা তুলবে, আর্থিক জীবনে কী ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে—এ ভাবতে গেলে অবাক বনতে হয়। এমন অবস্থায় যা দরকার, তা হচ্ছে ব্যুরোক্রেটিক যন্ত্র-পাতিকে ভেঙে চুরে ফেলা। তারপর প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনসাধন। বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দেওয়া। আদর্শবোধকে জাগিয়ে তোলা। কল্যাণমনোবৃত্তির পুষ্টিসাধন করা।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণাধীনে সামাজিক আচরণকে শক্তভাবে

আনা ভীষণ দুরূহ ব্যাপার বলে মনে হয়। এখানে একটা বিষয় করা যায়, সেটা হচ্ছে বেসরকারী ভাবে ইভ্যালুয়েশনএর কাজ। অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান নিজের প্রচেষ্টায় গবেষণার কাজ করে যেতে পারেন। সরকারী পরিকল্পনার কাজ কীরকম চলছে, কীরকম চলা উচিত এগুলো সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারেন। এখানে শুধু কাজ করবে নিঃস্বার্থ জনকল্যাণ কাজ করার মনোবৃত্তি। এখনকার অবস্থায় এ ধরণের কর্ম-প্রেরণার কথা ভাবা যদিও অনেকটা মুস্কিল ব্যাপার।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রশাসনিক কাঠামো যেভাবে চলছে, তাতে এর কাজ নিছক স্থিতিশীল অবস্থার চরিত্রে পর্যবসিত হবে। উন্নয়ন কমিশনার থেকে সুরু করে ব্লক ডেভালাপ্‌মেন্ট অফিসার সবার প্রশাসনিক দক্ষতা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এখানে শুধু এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ দক্ষতাই সব নয়। আরো বেশি কিছু দরকার। যেমন আগেই বলা হয়েছে, গবেষণাসুলভজ্ঞান যা দিয়ে অবস্থাকে গভীরভাবে বুঝবার চেষ্টা থাকবে। সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় আচার আচরণ, অর্থনৈতিক কাঠামো, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক, পারিবারিক সংগঠন ইত্যাদি। আদর্শবোধ যা একজনকে নিছক বস্তুগত অর্জ্জনের মধ্যেই সীমিত করে রাখে না, নিঃস্বার্থ কর্মসাধনের দিকেই তাড়না করে; সরকারী তকমার কৌলিন্য সহজেই বর্জন করে সবার সংগে এক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ নেতৃত্ব এখনকার রাজ্য-সিভিল সার্ভিস বা ভারতীয় এড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসের স্মার্ট ভদ্রলোকেরা দিতে পারছেন না।

এখন মনে এসে যায়, গ্রামউন্নয়নের নেতৃত্ব নিতে পারেন বুদ্ধিজীবীর দল। তারা কি ধরণের ভূমিকা নেবেন তার পরিষ্কার চিত্র দেবার আগে এখনকার বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা যাক সংক্ষেপে।

বুদ্ধিজীবী ও শুধুমাত্র শিক্ষিত—এ দুয়ে তফাৎ অনেক। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়েছেন তারাই যদি বুদ্ধিজীবী বলে পরিগণিত হন তবে সব বি. এ. এম-এ পাশই বুদ্ধিজীবী হয়ে যেতেন। কিন্তু আদতে ব্যাপারটা তা নয়।

বুদ্ধিজীবী হতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই একমাত্র প্রয়োজন নয়। যিনি বুদ্ধিকে ভিত্তি করে কোন বিশেষ কাজে বা বিষয়ে যাথার্থ খুঁজেন, যিনি গতানুগতিক অবস্থা চূড়ান্ত বলে মনে না করে নিজস্ব বুদ্ধির সাহায্যে অবস্থার উন্নততর পরিবর্তনের কথা নিয়ে ভাবেন (সে অবস্থা যে কোন বিষয়ের, রাষ্ট্রের, জীবনের, সমাজ মানুষের সব কিছুর ব্যাপারই), যিনি জীবনাশ্রিত অভিজ্ঞতার ভরে চর্চিত বিদ্যার সমৃদ্ধি আঁনবেন, যিনি বিশেষ মতকে গ্রহণ করবার আগে নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত রেখে তর্ক তুলবেন, যুক্তি নিবেন, যুক্তি দিবেন—সাধারণতর এমন ধরণের যিনি তাকেই আমরা বুদ্ধিজীবী বলব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাকতেই হবে এমন কোন বাধাধরা মত নেই। পাশ্চাত্যে ডিগ্রীর ভারে বুদ্ধিজীবীদের বিচার করা হয় না। তবে এদেশে যেখানে শিক্ষার হার লজ্জাকররকম সেখানে গ্রাজুয়েট ব্যক্তিকেই বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য করা হয়। এটা মস্ত বড় ভুল। আমি উপরের মাপকাঠি দিয়েই বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা ঠিক করে এ আলোচনায় নেমেছি।

আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। তাদের সামাজিক অবস্থানটা বিশ্লেষণ করা যাক। তাদের কেউ কেউ অধ্যাপনা করেন, কেউ রাজনীতি করেন। কেউ সাহিত্যের চর্চ্চায় থাকেন, কেউ সাংবাদিকতা করেন, কেউ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করেন,কেউ সরকারী চাকরী করেন, কেউ বা বেসরকারী চাকরী। যারা ছাত্রবয়সে বুদ্ধি জগতে স্বাধীন থাকবার চেষ্টা করেছেন, তারা যখন সরকারী চাকরীতে যোগদান করেন তাদের চেহারা তখন অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের স্ফূর্তির পরীক্ষায় জয়লাভ করে সমস্ত বুদ্ধিচর্চ্চার সংগ্রামের পাঠ থেকে বিরত হয়েন। প্রশাসনিক যন্ত্রের ভিতর কেউ বা হন ব্যুরোক্রেসীর শিকার, কেউ বা গড়েন ব্যুরোক্রেসীর প্রাচীর। যারা রাজনীতি করেন

না সে সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই শুধুমাত্র রাজনীতি নিয়ে বুদ্ধির চর্চ্চা করেন। রাজনীতি নিয়ে বুদ্ধির চর্চ্চা করেন বটে, কিন্তু চর্চ্চা পড়ে থাকে ইডিয়োলজিক্যাল স্ফিয়ারে বাস্তব জীবন ঘটনা বিশ্লেষণে রাজনীতি—বুদ্ধি আসে না। যারা বাস্তব ক্ষেত্রে রাজনীতি করেন, এবং সাংবাদিকতার পাঠ নেন, তাদের ভিতরই দেখা যায় অনেকখানি জ্ঞানের সামাজিকতা বা যাকে বলি 'সোসিয়োলজি অব্ নলেজ' সমাজের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাওয়া বিষয়গুলোকে নিয়ে নিজেদের জ্ঞানকে সামাজিক চেতনার স্তরে নিয়ে যাওয়া—এই যে 'সোসিয়োলজি অব্ নলেজ' এর মূল ভিত্তি সমাজবিজ্ঞানের ভিতর। রাষ্ট্রনিরপেক্ষ, সমাজনিরপেক্ষ বুদ্ধিচর্চ্চা এখন বেশি চোখে পড়ে। সাহিত্যিকদের অনেকেই রাষ্ট্রনিরপেক্ষ ও সমাজ নিরপেক্ষ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তার কারণ, তাদের মধ্যে দরদীপণা থাকলেও সংগ্রামী ও তুচ্ছ একাডেমী পুরস্কারের মোহ বর্জ্জন করবার মত সাহসী মন নেই বলেই আমার মনে হয়। যাদের শক্তিশালী কলম আছে বলে খ্যাতি, তাদের ভিতরই এমনটা দেখা যায়। নিছক ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির সম্বন্ধ বিশ্লেষণে তাদের ক্ষমতা নিঃশেষিত। সমাজ ও রাষ্ট্র, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি, ব্যক্তি ও সমাজ—এ সমস্ত সম্বন্ধে তাদের বুদ্ধিচর্চ্চা অনেকটা উদাসীন। নতুবা ভারতবর্ষের চেহারায় এখন যে একটা পরিবর্তনের স্পন্দন চিহ্নিত, এচিহ্ন কি কোথাও কি ছাপ ফেলছে সাহিত্যে? সে-পরিবর্তনকে একেকজন একেকরকম দেখবেনই তা-ওবা কোথায়। মোদ্দা কথা, এখনকার বুদ্ধিজীবীদের 'সোসিয়োলজি অব্ নলেজ'-এর অভাব যথেষ্ট আছে। তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও সামাজিক সংগঠনের ধার ধারেন না, ফলে হয় কি, সাধারণ মানুষের সংগে তাদের একটা বিরাট ফারাক রয়ে যায়।

স্বাভীনভাবে শুধু লেখার ভিতর দিয়েই বুদ্ধিচর্চ্চা করে জীবনযাত্রা চালান—এদেশের বুদ্ধিজীবীদের বেলায় ভাবা যায় না। কাগজে-কাগজে লিখে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তাতে তাদের মাসের অর্ধেক দিনের বেশি চলে না। বাইরে আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বহু বুদ্ধিজীবী স্বাধীনভাবে খেয়ে পরে ভালভাবে থাকতে পারছেন শুধুমাত্র লেখার ওপর ভরসা করে। ফলে তারা বড় বড় গবেষণামূলক কাজে হাত দিতে পারেন। আমাদের এখানে এধরণের কথা ভাবাটাই মুস্কিল। 'বস্'-এর মন জুগিয়ে চাকরী করার পর যেটুকুও বা সময় থাকে, তাতে বড় কাজে হাত দেওয়ার কথা ভাবা যায় না। যারা অধ্যাপনা করেন, তাদের ভিতর খুব কমই বড় কাজে হাত দেওয়ার কথা ভাবেন। এ-ই হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এখানকার অবস্থান।

বুদ্ধিজীবীরা সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনায় কীভাবে ভূমিকা নিতে পারেন? কতটুকু ভূমিকা নিতে পারেন? ভূমিকা পালনের পথে কতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পারে? এ প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ভারতবর্ষীয় বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে বেশ কিছু লোকের ধারণা বিশেষ সুবিধের নয়। তাদের স্নব-মানসিকতা নির্মমভাবে পীড়াদায়ক। শুধু পীড়াদায়ক নয়, সমাজ-প্রগতির বিরোধী। সাধারণ জনসমাজ তাদেরকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে রীতিমত অনিচ্ছার ভাব পোষণ করেন। কথাগুলো খাঁটি সত্য। তার জন্যে অনেকেই বলছেন, গ্রামের বিপ্লবে বুদ্ধিজীবী ভূমিকা স্মরণ করা গ্রাম বিপ্লবকে শতধাখণ্ডিত করে কেটে ফেলা। এধরণের যুক্তি এখন মানতে গেলে বিপদ আছে। ভূমিকাটা বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের বেছে নিতে হবে। তাদের উপর চাপিয়ে দিলে, ব্যুরোক্রেটিক যন্ত্রই কেবল তৈরী হবে। রুটিনমাফিক কাজ, বসে বসে মাসকাবারে টাকা গুণা, সরকারী পরিকল্পনার অবাস্তব, অ-সুন্দর নির্দেশ মানা ছাড়া তাদের কিছু থাকবে না। সুতরাং বুদ্ধিজীবীরাই এগিয়ে গিয়ে গ্রাম-উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নেই একথা মস্ত বড় ভুল। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, এস, কে, দে, আলবার্ট মেয়ার, সুধীর ঘোষ এ'রা কি বুদ্ধিজীবী নন? এখনকার গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনার যা কিছু গ্রহণ

করা হয়েছে সম্পূর্ণটাই বলতে গেলে এ'দের শিক্ষা থেকে নেওয়া হয়েছ। বুদ্ধিজীবীদেরই ভারতবর্ষের পরিবর্তিত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে এদায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজন আছে।

তবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই, বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতার পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন আছে। পরিবর্তনটা চিন্তার যেমন, তেমনি স্বভাবের-ও।

চিন্তায় পরিবর্তন কথাটা বিশদীকরণ যোগ্য। রাজনীতি একটা সর্বজনপ্রিয় বস্তু যাতে ভারতবর্ষীয় বুদ্ধিজীবীরা প্রচুর খাদ্য বস্তুর সন্ধান পান। কথা হচ্ছে, রাজনীতিতে কেউ মশগুল হতে চান, হোন, কারো আপত্তি নেই। কিন্তু রাজনীতি চিন্তার দুটো ভিত্তি আছে। একটা থিয়োরী গত। যেমন, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি হরেকরকমের। একটা প্রয়োগবিদ্যা গত। পরিবেশের বাস্তব তথ্যের পর্যবেক্ষণ, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্ধান, মানুষের আচরণের বিভিন্ন প্রকাশ ইত্যাদি ইত্যাদি।

থিয়োরীগত চিন্তা ও প্রয়োগবিদ্যামুখী চিন্তা—এ দুয়ের অবিচ্ছিন্ন গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদদের থিয়োরীতে নিঃশেষিত বুলিতে প্ল্যানিংয়ের সার্থকতা খুঁজেন। যারা প্ল্যানিংয়ের অফিসগুলোতে গিয়েছেন, তারা হুকুমতালিমের অভ্যাসে সিদ্ধহস্ত হয়ে পড়েন। প্রয়োগবিদ্যামুখী পরিকল্পনা-চিন্তার স্থান বুদ্ধিজীবীদের নেই। এমনকি, সাংবাদিকদের এবিষয়ে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তারা "ষ্টান্টে"র সন্ধানে ব্যস্ত আর আছে কাগজের সার্কুলেশন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধাবমান কতকগুলো 'মনভুলানো' সরকার বিরোধী কার্যকলাপের তথ্য অন্বেষণে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, প্রয়োগবিদ্যামুখী চিন্তার অনুশীলনের ভিতর দিয়ে পরিশীলন এবং তার পরে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে গেলে মানুষের কথা আনতে হবে। মানুষের খাওয়া-পরার সুচিন্তিত ব্যবস্থা করতে গেলে মানুষের জীবনচারণের পদ্ধতিকে চিনি নিতে হবে হুবহু করে। সামাজিক শত্রুগুলোকে মেরে ফেলতে হলে সামন্ততান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা জানতে হবে। তারপরে দাওয়াই। এত সমস্ত করতে 'ফিল্ড-ষ্টাডি'র প্রয়োজন হয়, গোটা ইতিহাসটা পড়তে হয়, সমাজবিজ্ঞানের লাইনগুলো ধরে এগুতে হয়। এদিকে ত বুদ্ধিজীবীদের নজর একেবারে নেই। 'থিয়োরী' গত চিন্তার ভিত্তি প্রয়োগবিদ্যামুখী চিন্তা। প্রয়োগবিদ্যামুখী চিন্তার কথা ছাড়া 'থিয়োরী' গত চিন্তা ত বন্ধ্যাবুদ্ধির নিষ্ফল আস্ফালন ছাড়া আর কিছু কি? ভারতের অর্থনীতি এখন-ও পুরোদস্তুর গ্রামীন। সমাজব্যবহারের গোটা চরিত্রটা না হলেও অন্ততঃ বেশীর অংশটাই গ্রামীন বিধি-নির্দেশের অধীন। ভারতের সমস্তটাই গ্রামীন। গুটিকয়েক শহর সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে বিপ্লব চালাবে, এ কখনোই সম্ভব নয়। গুটি কয়েক শহরকে আগে গ্রামে যেতে হবে, জানতে হবে, তবে গ্রাম-বিপ্লবের কথা ভাবা। এপরিবর্তন আনা দরকার ভারতবর্ষীয় বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার ভিতর।

প্রয়োগবিদ্যামুখী চিন্তার চর্চায় ডুবলেই সব সম্ভব হলনা, কারণ স্বভাবের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে এর সংগে। বুদ্ধিজীবীদের স্বভাব সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে কার্ল ম্যানেহাইম তাঁর 'Diagnosis of our time' বই খানিতে এবিষয়ে যে সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত করা চলে।

"..... the intellectuals are more or less regarded as a foreign body in the nation. They are either looked down upon, spiritually isolated, or not really taken seriously........... The man in the street who would like to believe that everything in the world could be settled in the term of habit and routine feels irritated by the existence of a group which wishes to go beyond that. In this case, the source of the disparagement of ideas and of the man who lives on having ideas is not only the reutier-class but also 'the practical' business man and certain

groups among civil servants. They all dislike ideas and the intelligentsia, because they fail to see that, in spite of their many short comings, small circles of the intelligentsia, by virtue of their being outsiders in society, are the main source of fermentation and dynamic imagination. (Diagnosis of our time, Page-42).

'ডাইনামিক ইমাজিনেসন'-এর সূত্র সমাজে আগন্তুকগণ্য বুদ্ধিজীবীরা বিরাট জনসাধারণের জীবনযাত্রা থেকে অনেক ক্রোশ দূরে। চিন্তার ভিতর সহানুভূতি তাদের থাকলেও সে সহানুভূতিকে স্বভাব থেকে তারা নির্বাসন দেন। যেসমস্ত বুদ্ধিজীবীরা গ্রামচিন্তায় মন দিতে চান, তারা গ্রামের জীবনে অভ্যস্ত না হলে গ্রামবাসীর সহানুভূতি অর্জনে মোটেই সক্ষম হবেন না।

যেসমস্ত সমাজউন্নয়ন ব্লক তৈরী হয়েছে বা হচ্ছে, সেখানে এবুদ্ধিজীবীরা সরকারীভাবে যোগ দিতে পারেন। তবে অবশ্য এখানে একটা কথা আছে। বুদ্ধিজীবীদের নির্বাচনের ধরণ 'সিভিল সার্ভিস' প্রণালীতে হলে চলবে না। গ্রাম সম্পর্কে যারা চিন্তা করেন, তাদের গ্রামের জীবনসম্পর্কে কতটুকু জ্ঞান আছে এপরীক্ষাটাই মুখ্য হবে। গ্রামের অর্থনীতি, গ্রামের সমাজ-কাঠামো, গ্রামের কৃষিব্যবস্থা, পৌর ব্যবস্থা, গ্রামের মানুষের মানসিকতা এসম্পর্কে জ্ঞানটাই প্রথম থিয়োরীগতভাবে পরিষ্কার করে পরীক্ষা করা। যারা এ থিয়োরী গত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন, তাদের বাস্তবজীবনে ফেলে দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পরে ফাইনাল পরীক্ষা নিতে হবে। বাস্তবপরীক্ষায় তারা কতখানি গ্রামের লোকের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন, কে কতখানি 'ইনিসিয়েটিভনেস' দেখাতে পেয়েছেন কে কতখানি চাষের খুটিনাটি হাতে হাতে শিখেছেন— এগুলো দেখতে হবে। তবে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার, সমবায় পরিদর্শক, কৃষি পরিদর্শক ইত্যাদি ইত্যাদি পদে উপযুক্ত লোক যাবেন। আর নতুবা স্বাধীন দেশে ঔপনিবেশিক মেজাজের মানুষরা ব্যুরোক্রেটিক যন্ত্রকে মুষ্টিমেয়ের করে গড়ে তুলবে।

এখন যদিও প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এ সমস্ত ব্যাপারে, কিন্তু এদের দ্বারা গ্রামসেবক বা গ্রামসেবিকার কাজই ভাল হবে। দায়িত্বপূর্ণ পদে এদের বসানো অসুবিধাজনক হবে। এ ত গেল সরকারী ভাবে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ।

বেসরকারীভাবে তারা যদি এগোন, তবে তা হবে দুরকমভাবে। একরকম হচ্ছে, প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে ও অন্যরকম হচ্ছে, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভিত্তিতে।

প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে কীভাবে করা যায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগের ভিতর দিয়ে, সংবাদপত্রের সুসংগঠিত সাংবাদিকমন্ডলী দিয়ে, রাজনৈতিক দলের নিজেদের দায়িত্বপূর্ণ কর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে। এগুলো মুখ্যতঃ হবে গবেষণামূলক। গবেষণার ফল প্রকাশ করা ও সরকারের উচিত এদের গুরুত্ব দেওয়া।

আর ব্যক্তিগতভাবে যেটা হবে সেটা সম্পূর্ণ নিজস্ব চেষ্টায়। নিজের স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রচেষ্টায় নিঃস্বার্থভাবে গবেষণা করে বই আকারে প্রকাশ করা, নানা পত্রিকাদিতে আলোচনা প্রকাশ করা—এম্নিভাবে। যেখানে ফ্রিলান্স জার্ণালিজমে সারা মাস লিখেও পেট ভরে না, সেখানে ব্যক্তিগতভাবে ওরকম চেষ্টার কথা বলা একটা কষ্ট-কল্পনা। এরকমভাবে কাজ করতে কাউকে আহ্বান করা যায় না, এ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রবৃত্তির থেকে উৎসারিত হবে।

ব্যাপকভাবে সুচিন্তিত সুসংগঠিত এবং সুপরিচালিতভাবে গ্রাম পরিকল্পনা নিয়ে উঠে পড়ে যদি না লাগেন বুদ্ধিজীবীরা তবে পরিকল্পনার সাথে সাথে সামাজিক রূপান্তর মোটেই আয়ত্ত হবে না। আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ও 'ওয়েস্টার্ণাইজড্ স্মার্টনেস্' বর্জন পুরোপুরি দরকার হবে যদি কোন না ভাবে বুদ্ধিজীবীরা গ্রামের মুখে পা বাড়াতে চান। এসংগে দৈহিক শ্রমের ওপর মর্যাদা ও গুরুত্বের কথাও স্মর্তব্য।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

দারুন বিপর্যয় যখন মানুষকে ঘিরে ফেলে এবং সেই বিপত্তিকে অতিক্রম করার পথঘাট সব বন্ধ হয়ে যায় তখন তাকে হতে হয় বেপরোয়াভাবে উদাসীন ও তার সকল দুশ্চিন্তাকে এড়াবার চেষ্টা চলে দার্শনিক ভাবনায়। আমি তাই উপায় না দেখে যুদ্ধের প্রকোপে আসন্ন সমস্যাগুলির দুর্ভাবনাকে সারাবার জন্য 'এমন বিশ্বধ্বংসী লড়াই এল কেন' তার সমালোচনায় মনকে নিবিষ্ট করতে প্রয়াসী হলাম।

ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা নানান ব্যাখ্যায় প্রমাণ করে দেবেন প্রতিটি মহাযুদ্ধ হবার কারণ ও পরিণামকে। সাধারণের কাছে কিন্তু মনে হয় যে লড়াই লাগিয়ে দেয় সামরিক শক্তিতে স্ফীত কয়েকজন মাথা গরম নেতৃবর্গ। তাঁরা মানুষের আদিম হিংস্র স্বভাবকে জাগ্রত ও উত্তেজিত করে এদের জীবনহুতিতে আপন জিঘাংসা ইপ্সাকে যেন তৃপ্ত করে থাকেন।

কেন্ এ বেলুকে বধ করার অনেক আগেই মানুষের উপলব্ধি হয়েছিল যে এ হত্যা নিদারুণ অন্যায় ও মহাপাপ। কিন্তু তা সত্বেও অনাদিকালধরে মানুষ—অন্যান্য প্রাণীর কথা তো অবান্তর, আপনার জাতভাইদের হত্যা করে চলেছে। শুদ্ধভাবে চিন্তা করলে রাজনৈতিক কারণে ও আইন সম্মতভাবে মানুষ মারাকে মানবতার নীতি ও যুক্তিতে উন্মুক্ত সভ্য মানুষ কোনদিন সমর্থন করবে না। অবশ্য সেধরণের লোকের সংখ্যা যুগে যুগে কম বেশী হয়ে থাকে এবং সেই অনুপাতে জগতে হত্যার পরিমাণকে সঙ্কুচিত ও সম্প্রসারিত হতে দেখা যায়। পশু প্রবৃত্তিগত আদিম হিংস্রস্বভাবের তাড়নাকে মানুষ সভ্যতার অনুশাসন ও ধর্মনীতির একটা প্রলেপ দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় এবং মাঝে মাঝে এর প্রেরণা ও উত্তেজনাকে পরোক্ষভাবে স্তিমিত ও তৃপ্ত করে নেয় নানা ছলে। বহুবিধ খেলার প্রতিযোগিতা, ব্রাড স্পোর্ট, বক্সিং ফাইট, সাহিত্য ও নাটকের সংহার কাহিনী ও অভিনয় সভ্যতার গিন্টিতে ভরা মানুষের বর্বর ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করছে ভদ্রভাবে। প্রত্যহ বাস্তবে ঘটিত ধর্ষণ, লুণ্ঠন, খুন জখম ও মৃত্যুদণ্ডের কাহিনীগুলি সংবাদপত্রে সবিস্তারে না ছাপালে সাধারণ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকদের কাছে খবর একেবারে পানসে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। নিবিণ্ডভাবে এগুলি পড়বার সময় অবচেতন মনে পাঠক কল্পনায় করে যায় বাস্তবে অন্যের করা ধর্ষণ ও হত্যা ও কল্পনায় নিজেই জল্লাদ সেজে তুলে দেয় দণ্ডিতের গলায় ফাঁসীর দড়িটি অথবা খাঁড়ার শেষ নির্মম আঘাত।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার বছর খানেক আগে জার্মান ভিনম্যান ও তার সহকারী খুনী ফরাসী যুবকে মিলে তরুণী ও যুবতী নারী হত্যার যেন এক মহামারী প্যারিতে এনেছিল। পাশবিক হত্যাকাণ্ড কাহিনী প্রেসে বেরুতে শুরু হলে সহস্র সহস্র পাঠক বাগুভাবে পড়ে যেত সেই খবরগুলি। এমনকি আসন্ন ভয়াবহ যুদ্ধের সংবাদ প্রাধান্যও এই কাহিনীর উচ্ছ্বাসে কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল।

ভিনম্যান ও তার সাকরেদ চালাকি করে সংবাদপত্রে নার্স, মহিলা সেক্রেটারী কিংবা দোকানে পণ্যবিক্রয়িণী চাই বলে বিজ্ঞাপন দিত এবং আবেদনকারিণীদের মধ্যে থেকে কোন সুরূপা তরুণী বা যুবতীকে বেছে নিয়ে করত তাদের শীকার। তারপর তাকে কোন অছিলায় ভুলিয়ে নিভৃত স্থানে নিয়ে গিয়ে তার কপালে গুলিমেরে হত্যা করতো। নিছক হত্যা করা ছাড়া অন্যভাবে ধর্ষণ বা নিপীড়নের অভিসন্ধি তাদের ছিল না।

ধরা পড়ার আগে যে শেষ তরুণীকে নিহত করা হয় তাকে গুরুর শেখানো হাত সাফাই

দেখাতে হত্যা করে ভিনম্যানের সহকারী ফরাসী যুবকটি। মেয়েটির দেহ তারা দাঁফে রসরুর ঐতিহাসিক স্থানে ক্যাটাকম্বের নিকট এক নালায় ফেলে আসার সময় হত্যাকারী যুবক প্রথম বয়ের উত্তেজনায় অসাবধান হয়ে তার হাতের একটা দস্তানা ভুলে ফেলে আসে। পুলিস সেটির নিশানা নিয়ে তাকে সনাক্ত করে গ্রেপ্তার করলে সে ভয়ে সবিস্তারে তাদের জানিয়ে দেয় তারা দু জনে কতগুলি রমণীর প্রাণনাশ করেছে। অভিযুক্ত হয়ে বিচারে গিলোটিন-এ মৃত্যুর দন্ড পেল ভিনম্যান এবং তার সহকারীর হল যাবজ্জীবন কারাবাস।

ভিনম্যান এর স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্র সহ ছোট পরিবারে কোন অভাব ও অভিযোগ ছিল না বরং তাদের দাম্পত্য জীবনকে পড়শীরা এক আদর্শ সুখী পরিবার বলেই জানত। কিন্তু কোন কারণে সে হল এমন নির্মম পাষন্ড। পৃথিবীর নানানদেশ থেকে মনস্তত্ত্ববিদ পাণ্ডিতরা তার এই অদ্ভুত মনোবৃত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করতে সময় পাবার উদ্দেশ্যে ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানালেন ভিনম্যানকে গিলোটিন করার দিন পিছিয়ে দিতে। কিন্তু তাঁদের অনুরোধকে উপেক্ষা করে তার মৃত্যুর নির্ধারিত দিনকে বজায় রেখে দেওয়া হল।

সংবাদ ছিল যে ফরাসী রিপাবলিক এর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এতবড় খুনী আসামীর প্রাণদন্ড করা হবে প্রকাশ্যে জনতার সামনে।

প্যারি শহরে দিগদিগন্ত থেকে জমা শুরু হল প্রকাশ্যে মানুষের মস্তকচ্ছেদন দেখবার আগ্রহে আগত অসংখ্য দর্শক। রাত্রিবাসের উপযোগী বা অনুপযোগী যা কিছু আশ্রয় ভাড়া পাওয়া যেতে পারে সেগুলি সব আগন্তুকের ভিড়ে ভরে গেল। এমনকি স্টেশনের প্ল্যাটফরমগুলিতে পর্যন্ত এই দর্শকরা অস্থায়ীভাবে থাকবার স্থান করে নিল। প্যারিতে এই ক্রমবর্দ্ধিত অসংখ্য লোক সমাগম দেখে বিপত্তির আশংকায় ফরাসী সরকার ঘোষণা করলেন যে ভিনম্যানের গিলোটিন সম্পন্ন করা হবে প্যারিতে নয় ভেয়ারশাই শহরে। কিন্তু কেবল স্থান পরিবর্তনে কি এই নরমেধ যজ্ঞের উপাসকদের ঠেকিয়ে রাখা যায়। তারা তখনি ছুটল ভেয়ারশাঁইএ।

এই দর্শকদের স্রোতবাহী হয়ে লন্ডন থেকে এলেন বহু ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক ও পর্যটকেরা। তাঁরা প্রায় দাবী করলেন যে প্যারিনিবাসী ছাত্রদের তাঁদের থাকবার ও গিলোটিন দেখবার সব ব্যবস্থা করে দেওয়া একটা অবশ্য কর্তব্য বলে ধরে নেওয়া উচিত।

গিলোটিন দেখবার জন্য তাঁদের আয়োজনের ঘটা দেখে জিজ্ঞাসা করলাম দণ্ডিতের নিধন দৃশ্য দেখতে কৌতূহলী ও বুদ্ধি বিবেচনাহীন জনতার সঙ্গে তাঁরা কি করে নিজেদের মিলিয়ে ফেল্লেন। শুনে তাঁরা সবাই বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বল্লেন "সেকি মশাই আপনি এ দেখতে যাচ্ছেন না!" না বলায় তাঁরা উপদেশ দিলেন "শিল্পী হিসেবে আপনার এ গিলোটিন দেখা অবশ্য প্রয়োজন বিশেষ করে যখন এ অভিজ্ঞতা লাভ মানুষের ভাগ্যে কদাচিৎ হয়ে থাকে। ভেবে দেখুন এই অভিজ্ঞতা হয়ত আপনাকে এক অনুপ্রেরণা দিয়ে বিরাট এক শিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনা এনে দেবে।"

হেসে বল্লাম "সে অভিজ্ঞতা হবার আগে আপনাদের এ ব্যাপারে যে জল্লাদী আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখছি তাকে নিয়েই তো অনেক বড় শিল্পের মাল মশলা তৈরী হয়ে যাচ্ছে। আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা চাপালে রেণ্ এ হেমারেজ হয়ে যেতে পারে। তাই আপনারাই এই অমূল্য অভিজ্ঞতা করে আসুন। পরে যদি প্রয়োজন হয় তো আপনাদের কাছ থেকে এর খানিকটা ধার নেওয়া চলবে।

ভেয়ারশাইতে বধ্যমঞ্চের যতখানি নিকট হতে পারে সরকার অনুমোদিত এমন স্থানে উঁচল কাঠের তৈরী ধাপে ধাপে আসন। এই আসনে বসবার টিকিটের জন্য অসম্ভব উচ্চহারের মূল্য ধার্য্য করা হলেও মুহূর্তে ক্রেতারা তা সবগুলি লুটে করে নেবার মত ভাবে কিনে ফেল্ল শতশত দর্শকদের এ স্থানের টিকিট না পাওয়ায় নৈরাশ্যে হাটফেল করার মত অবস্থা হল। নিকটবর্তী বাড়ীগুলির ছাদও

বারান্ডায় দাঁড়িয়ে দেখবার স্থানগুলিও ভাড়া হয়ে গেল অবিশ্বাস্য উচ্চ মূল্যে।

গিলোটিন সম্পন্ন হবার দিনের পূর্ব সন্ধ্যায় হিটলার ঘোষণা করলেন যে তিনি এই অত্যন্ত পশুরও অধম ঘৃণিত অপরাধের জন্য ভিদম্যানকে জার্ম্মান নাগরিকের অধিকারচ্যুত করলেন।

যে নরাধম পাষন্ড লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী ও শিশুকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করেছে তার এই কপট মরালিটির ভাণ যুদ্ধের আগে সবচেয়ে অমার্জ্জনীয় পরিহাস।

পুরো একটা বিনিদ্র রজনী বসে কাটিয়ে গিলোটিন দেখে দর্শককুল ফিরলেন প্যারিতে। তাঁদের ভেয়ারশাইতে যাওয়া ও ফিরে আসায় যে ভাব-বৈচিত্র্য দেখলাম তাতে মনে হল পূর্বে তাঁরা যেন মাড় দিয়ে মড়মড়ে ইস্তিরি করা কাপড়ের মত ছিলেন তাজা ফিটফাট ও চোস্ত কিন্তু ফিরলেন তাঁরা যেন দলামলা ঝুলেপড়া বাসি কাপড়ের তাল হয়ে যা দেখবার আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন এত কষ্টকে উপেক্ষা করে তা দেখার পর কিন্তু তাঁদের হাবভাবে তৃপ্তি বা উদ্দীপনার ছাপ খুঁজে পাওয়া গেল না।

প্রশ্ন করে জানলাম যে তাঁরা ফরাসী সরকারের বেরসিকতায় অত্যন্ত ক্ষুন্ন ও রুষ্ট হয়েছেন। প্রকাশ্যে গিলোটিন করা হবে এ ভাঁওতা দেবার কি প্রয়োজন ছিল যখন পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে বধ্যমঞ্চের এমন নিকটবর্তী স্থানে দর্শকদের বসতে দেওয়া হয়নি। তাও যদি বা মাপ করা যায়, ভিদম্যানের মুন্ডচ্ছেদন ভোর ছ'টার অন্ধকারে করার জন্য ফরাসী সরকারকে কোনমতেই ক্ষমা করা যায় না। মঞ্চের চারপাশে যে ফ্লাড্‌লাইটের ব্যবস্থা ছিল তাতে দৃশ্যকে পরিষ্কার করা দূরে যাক্ আরো নাকি ঘোলাটে করেছিল। ঘড়ির কাঁটা ছ'টায় পৌঁছালে মঞ্চে পূর্বে স্থির আলোছায়ায় একটা স্পন্দন লক্ষ্য করে মনে মনে তাঁরা ভিদম্যানের মুন্ডটি কেটে পড়ছে তার একটা কাল্পনিক দৃশ্যকে সামনের অস্বচ্ছ কুয়াসাকে সরিয়ে দেখবার অক্ষম চেষ্টা করছিলেন। এইটুকুই তাঁদের স্মৃতির খাতায় অমূল্য ছাপ হয়ে থাকবে। আর কিছু হোক না হোক যে ভোরের বাতাসে ভিদম্যানের শেষ নিশ্বাস মিশে গিয়েছিল ও তার খণ্ডিত দেহের তাজা রক্তের গন্ধ যে বায়ু তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল তারি সান্নিধ্যে থেকে সেই বাতাস নাকে নিয়ে তাঁরা ফিরেছেন এও কি কম কথা।

একটা বান এসে চলে যাওয়ার মত দর্শককুল শহরকে দু'একদিনের জন্য জনবহুল করার পর যে যার গন্তব্যে প্রস্থান করে প্যারিকে আবার স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে দিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রলয় স্মৃতি মন থেকে মুছে যাবার আগেই এসে পড়ল আর এক আরও ভয়াবহ বিশ্বসংগ্রাম। এ যুদ্ধ সম্ভাবনার নানা যোগাযোগের স্রোতাবর্ত্ত বছরের পর বছর অশান্তির ধারা দিকে দিকে ছড়িয়ে শেষে একজোট হয়ে মিশে এনেছে এই ব্যাপক মহাধ্বংসের প্লাবন। প্রথম মহাযুদ্ধ পরিসমাপ্ত হওয়ার আগেই শান্তিকামী জনগণ নানা দেশে অগ্রণী হয়ে এই মহাধ্বংসের পুনরাবৃত্তিকে প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে স্থাপন করে জগতের আন্তর্জাতিক সম্মেলন "লিগ অব নেশন"। কিন্তু লিগ অব নেশনএর শক্তিবর্গ এই দারুন সংগ্রামের সূচনা চোখের সামনে তৈরী হচ্ছে দেখেও তার স্বরূপকে যেন দেখতে পান নি। দেশে দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে লিগের সদস্য মিত্রশক্তি গণের ধারাবাহিক উদাসীনতা যে এই জগতজন-বিলোপ-সংঘারকে স্বচ্ছন্দে ডেকে এনেছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৩১ এ জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণকে দ্বিতীয় মহাসংগ্রামের বোধন বল্লে অত্যুক্তি করা হবেনা। কিন্তু জাপানের এই অভিযান ও আক্রমণের প্রতিরোধার্থে লিগ অব নেশন থেকে কোন স্বক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। এই অন্যায় পররাষ্ট্র অপহরণ যাতে বিনা দ্বিধায় করা যায় তারজন্য জাপান এই সময় লিগএর সঙ্গে সুবিধামত সর্ব্বসম্পর্ক পরিত্যাগ করে। তারপর ১৯৩৫শে

ইতালির ইথিওপিয়া আক্রমণ ও অধিকার এবং পর বৎসরে হিটলার ও মুসোলিনির স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে অভিসন্ধিপূর্ণ সশস্ত্র হস্তক্ষেপে বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক শান্তির কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার হতে থাকলেও লিগভুক্ত মিত্রশক্তি সদস্যদের মধ্যে এর প্রতিবিধানে কোন উদ্যম দেখা যায়নি। বরং তাঁরা যেন ননইনটার-ভেনসন্ নীতির আহিফেন সেবনে বেহুঁস ও নিরপেক্ষী হয়ে ফ্যাসিষ্ট ঘাতকদের সীমাহীন ধর্ষণ লুণ্ঠন, ধ্বংস ও হত্যার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন।

অতীতের সামরিক অভিযান ও বিজয়ের স্মৃতিতে গর্ব্বিত জার্ম্মান জাতি প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়কে সত্য ঘটনা বলে গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের ধারণায় বীর্য্য বিক্রমের চেয়ে ছল চাতুরীর দ্বারা বিপক্ষশক্তি জয়লাভ করেছিল এবং এই প্রতারণার জন্য যে অপমানের কালিমা জার্ম্মান জাতির উপর পড়েছে তার প্রতিকার ও প্রতিশোধের উগ্রতাকাংখায় তারা গুমরে মরছিল। হিটলার এই জাতীয় বিভ্রান্তি ও ক্ষোভকে উদ্বেলিত করতে যে মিথ্যা অভিযোগ জাহির করেছিলন তাকে তাঁর জাতভাইয়েরা ব্যগ্রভাবে সমর্থন করেছিল। তাই তিনি লোকারনো চুক্তিকে প্রথমে মেনে নিয়ে পরে আপন স্বার্থ-সিদ্ধান্ত ১৯৩৩শে তাকে অস্বীকার করে রাইনল্যান্ড আক্রমণ ও অধিকার করায় আপন দেশবাসীর কাছে জার্ম্মান সামরিক শক্তির এক পয়গম্বর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি জাগতিকভাবে প্রায় সর্বদেশে বিরাট একটা অর্থ সমস্যা এসে পড়েছিল। মিত্রশক্তিবর্গ যদি এই সমস্যাকে সময়ে মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হতো তা হলে বোধ হয় ফ্যাসিষ্ট শক্তির পরিবর্দ্ধন বন্ধ হয়ে যেত। মিত্ররাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থমানের যে গরমিল ছিল তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার পথে প্রধান অন্তরায় হয় তখনকার মার্কিণী সরকার এবং এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন প্রেসিডেন্ট রুসভেল্ট। তিনি এক ভ্রান্তধারণায় স্থির করেছিলেন যে তাঁর দেশের ব্যবসায়ী-লেনদেনএর শুভার্থে মার্কিণী মুদ্রার উচ্চহারকে বজায় রাখা উচিত। তাঁর এই ভ্রান্ত নীতিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংকট আরো নিকটবর্ত্তী হয়ে আসে।

প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মাণীর সামরিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক এমন কোন অত্যাবশ্যক কারণ দেখা যায়নি যার জন্য তার যুদ্ধ লাগাবার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। লিগ অব নেশনএর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এমন কোন বিধি ব্যবস্থা ছিল না যাতে করে কোন রাষ্ট্রের আবশ্যকের অতিরিক্ত সামরিক শক্তি সঞ্চয়কে প্রতিরোধ করা যেত। লিগএর নিয়ম কানুনে বহু দুর্বলতা থাকায় কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তি ভাঙ্গতে উদ্যত হলে তাকে দমন করবার মত ক্ষমতা ছিল না। কাজেই নূতন সামরিক শক্তিতে বলিয়ান হিটলারীয় জার্ম্মানী যে রাজ্যগুলি আত্মসাৎ করবার মতলব করেছিল তার প্রথম শীকার হয় অষ্ট্রিয়া। চ্যান্সেলার ডল্‌ফাস দেশের শাসনশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও বলশালী করতে চেষ্টিত হল এবং শাসনবিভাগের কার্য্য ও দায়িত্ব থেকে ন্যাৎসীদের বাদ দেওয়ার ফলে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করা হ'ল। নতুন চ্যান্সেলর সুস্‌নিগকে ষ্টরমট্রুপাররা ভয় দেখিয়ে নিজেদের সুবিধামত চুক্তিতে জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি করাতে বাধ্য করল। তারপর তাঁকে বহুবিধভাবে লাঞ্ছিত করে দেশের আভ্যন্তরিক গোলমাল মিটাবার অছিলায় ১৯৩৮শের মার্চ্চ মাসে হিটলারএর সৈন্যবাহিনী অষ্ট্রিয়া অধিকার করে বসল। তারপর কোপ পড়ল চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর। ডাঃ বেনেস্ যখন মিত্রশক্তির কাছে এই সংকট প্রতিহত করবার জন্য সাহায্যভিক্ষা করলেন তাঁকে এর নায়করা জার্ম্মানীকে সুতেদেন অংশটি ছেড়ে দেবার উপদেশ দিলেন। বেনেস এই উপদেশ গ্রহণে অস্বীকার করায় সমগ্র জার্ম্মান সামরিক শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ার সমস্যায় হলেন একা। ১৯৩৮শে সেপ্টেম্বরএ ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়া ধ্বংসে উদ্যত জার্ম্মান শক্তিকে প্রতিহত করবার এক অমূল্য সুযোগ হেলায় ছেড়ে দিল। ফ্রান্সের ও ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়, দালাদিয়ের ও চেম্বারলেন এর মতে এই সামান্য ভূমিখণ্ডের স্বাধীনতা বাঁচাতে একটা বড় হাঙ্গামকে ডেকে আনা উচিত ছিল না। এই দুই দেশের জনগণও এই সিদ্ধান্তে আসন্ন বিপদকে সহজে

এড়ান গেল ভেবে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছিল রাশিয়ার মতিগতি সম্বন্ধে সদা সন্দিহান এই রাষ্ট্রনায়করা একে বাদ দিয়ে জার্মানীর সঙ্গে মিউনিকের চুক্তি করে নিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে এই নিপুণ চালে তাঁরা দুষমণ জার্মানীকে দিয়ে শয়তান রাশিয়ার উপর হামলা করবার একটা মোক্ষম ব্যবস্থা করে ফেলেছেন এবং তাঁরা স্বপ্ন দেখছিলেন যে তাঁদের ছোড়া এই ঢিলে দু'টি রক্তপিপাসু পাখীর নিপাত হতে আর বেশীক্ষণ লাগবে না। এই সময়ে মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট সৈন্যবাহিনী বিরুম দেখতে ক্ষুদ্র আলবানিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তার স্বাধীনতা কেড়ে নিল। তদানীন্তন রাশিয়ার পররাষ্ট্র সচিব ম্যাক্সিম লিটভিনফ্ ফ্রান্স ও ব্রিটেনএর সঙ্গে মিলিত হয়ে ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী শক্তির এই দুর্ব্বিনীত পররাষ্ট্র অপহরণকে প্রতিহত করবার যে প্রস্তাব করেন তাতে দালাদিয়ের ও চেম্বারলেন কোন আস্থা দেখাননি। শেষে নিজেদের সীমান্তকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত রাখবার উদ্দেশ্যে রাসিয়ান নেতারা ১৯৩৯এর আগষ্ট মাসে জার্ম্মানীর সঙ্গে দশবছরের জন্য ননইনটারভেনসনএর এক চুক্তি করে নিলেন। একরকম নির্ব্বাক হয়ে হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলেন অনতিপরেই। এইবার মিত্রশক্তিবর্গের ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী নেতাদের আসল অভিসন্ধি সম্বন্ধে চৈতন্যোদয় হল। কিন্তু এই দিব্যজ্ঞান পেতে অহেতুক বিলম্ব করায় তাঁরা মহাযুদ্ধকে আর দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। মনে মনে ধারাবাহিক ঘটনাবলীকে অনুসরণ করে দেখলাম যে যা উপলক্ষ করে তৈরী হয়েছে আজকের এই মহাসংগ্রাম তার জন্য দায়ী—শান্তিকামী বলে চেঁচালেও, কয়েকটি রাষ্ট্রের অদূরদর্শী অধিনায়করা। তাঁরা সময়ে সজাগ ও সক্রিয় না হওয়ায় সর্ব্বগ্রাসী লড়াইএর এই বিভীষিকা সারা জগতকে আজ এমন নৈরাশ্যময় ও অসহায় করে তুলেছে।

এবার ফিরাও মোরে

সহরে কোন একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে অধ্যাপকদের ঘরে বসেছিলাম, জনৈক বন্ধু অধ্যাপকের সাক্ষাৎ প্রয়াসে। নানা খোস গল্প চলছিল। একজনের মন্তব্য কানে এল, স্বগতোক্তি নয়, জনান্তিকে ব্যক্তিবিশেষের কাছে বলেও মনে হল না, সারা ঘর জুড়ে তা শোনা গেল। তিনি বললেন, আর জন্মে যে অবস্থায়ই জন্মাই, পয়সা চাই।

কত পয়সা পেলে আপনি খুসী হবেন? অপর এক অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন।

অঢেল পয়সা, তিনি জবাব করলেন, কলেজে তিনবেলা চাকরী করে, হেলপ্ বুক লিখে, ছাত্র পড়িয়ে, খাতা দেখে যত পাওয়া যায়, তার অনেক অনেক গুণ। বলেন কি মশায়! আজ টাকারই তো সম্মান। নইলে কে কাকে পোঁছে!

অনেকেই সায় দিলেন ওঁর কথার বিরোধিতা যে কেউ করলেন না তা নয়। আমি ভাবতে ভাবতে বেরলাম, সত্যি টাকার দরকার যে কি পরিমাণ, তার কি কোন সীমা পরিসীমা আছে! চালের মণ ৩৫৲, মাছ ন্যূনপক্ষে চার টাকা সের। ঘৃত (থুড়ি—দাল্‌দা) লবণবস্ত্রেন্ধন চিন্তায় সব জিনীয়াস কুঁকড়ে মাটি হয়ে যাচ্ছে। নুন আনতে পান্তা নয়, চাল আনতে কয়লা ফুরোয়। এক-দিনের বাদশাহী ২৯ দিনের নিঃস্বতার জ্বালা শান্ত করতে, পারে না। আর শুধু খাওয়া পড়া, বাড়ী বাত্তি-র খরচই তো নয়; সামাজিকতা, সিনেমাদি রিক্রিয়েশান, অতিথিসৎকার, যাওয়া-আসা পোষাকপরিচ্ছদে প্রচলিত সমাজের স্ট্যাণ্ডার্ড রক্ষা করে চলা—কীযে ব্যাপার কাকে বলবো। আর বলার দরকারই বাকি? মধ্যবিত্ত সমাজের সবাই তো আজ ওই এক এপিডেমিকে ভুগ্‌ছে—অ্যাকিউট পাইসলেসনেস টার্ণড্ ক্রণিক।

বেল-বরো-স্টিল, যেভাবে হোক খরচ চালাতেই হবে। বেগ্ করলে ইজ্জত যাবে, অবশ্য সবাই যা দেবে তা হল শুকনো উপদেশ—কাট ইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু দি ক্লথ। বরো করতে পেলেও সেই একই চাঁজ জুটবে। আর যদিবা সত্যি টাকা জুটলো তো সুদ দিতে দিতে ফর এভার ইন বাড়ন্ত ডেট। স্টিল? তার যোগ্যতা এবং শিক্ষা কোথায়? পরীক্ষার হলে চুরি বিদ্যার অভিজ্ঞতা কোন কাজে লাগেনা সংসারে। আসলে আজকের দিনে চুরি করাটা ধনী ও প্রভাবশালীর পক্ষেই মানায়—ওটা বোধ হয় তাদের একচেটে অধিকার।

ক্লথ অনুসারে কোট কাটতে গেলে হয়তো কোটের হাতাই হবে না, কিংবা ঝুলে হবে হাস্যকর রকমের ছোট, অথবা গায়ে কেটে বসবে—সানফ্রাইজ্‌ড কাপড়ের বিজ্ঞাপনী ছবির মত। আসলে কোট যদি পরতে হয়, প্রয়োজন মত কাপড় সংগ্রহ করতেই হবে। কাজেই ভাবতে হবে কোট আদপেই পরবো, না শার্ট পাঞ্জাবিতেই চালাবো।

কারুর কাছে চাই-ও না কাউকে দি-ও না—এ বিজ্ঞরীতি অনুসরণ করা যাদের মানায় তাদের ঈর্ষা করি।

টাকা চাই, কি ভীষণভাবে চাই তা বলে বোঝাবার ভাষা নেই। কিন্তু মুশ্‌কিল হল, ইস্কুল থেকে স্মৃতির যদি বা জোটে টাকা যে কোন উপায়ে জোটানো রুচিশীলের পক্ষে সম্ভব নয়। টাকার জাত জেনেই মুশ্‌কিলে পড়ে গেছি। আর ছোট জাতের আজ যেমন কৌলিন্যবোধ জেগেছে, বে-জাত টাকাও আমাদের হাতে আসতে নারাজ। তাই টাকা চাই বলে হাহুতাশ করে পাথরে মাথা ঠুকে মরার নিরর্থকতা-ই আজ প্রকট হয়ে উঠছে।

টাকা নইলে টু এণ্ডস্ মীট করানো অসম্ভব। তবু টাকা চাইলেই পাওয়া যায়না একথা বুঝতে পারলে এণ্ড দুটোকে সরিয়ে কাছাকাছি আনার প্রচেষ্টা ছাড়া উপায় থাকে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেকার জীবনযাত্রার মান আর আজকের জীবনযাত্রার মান তুলনা করলে মনে হবে জাতীয় সম্পদ বিশগুণ বেড়ে গেছে। অথচ বেড়েছে যে সামান্য সে কথা প্রতিদিনের অঙ্কের হিসেবে প্রমাণ হচ্ছে।

যিনি বিশ বছর আগে টিনের চালের নিচে টিনের দেওয়াল ঘেরা ঘরে আট আনার চাটাই-এ গা এলিয়ে ছেঁড়া হাতপাখা খটখট করে পরম নিশ্চিন্তে ও স্বস্তিতে দিন কাটাতেন, আজ তাঁরই ছেলে খাট-শোফা-ড্রেসিং টেবল ওয়ার্ডরোব রেডিও সেলাইকল ও ওপরে পাশে বিজ্‌লি পাখা নিয়ে বলছে, কি দিন কালই পড়লো, কিছুতেই ম্যানেজ করা যাচ্ছে না।

আরে যাবে কি করে। সবাই যদি মনে করে আমাকে স্যার বীরেনের স্ট্যাণ্ডার্ডে থাকতে হবে তাহলে কোনদিন কোন সমাজেই জীবনযাত্রা ম্যানেজ হয় না। অথচ আজ প্রতিটি কেরাণীও চায় যে তার স্ত্রী নেহরু দুহিতার মত দুশ টাকা দামের কঞ্জিভরম শাড়ী পড়ে মাঝে মাঝে ক্যাপ্রি বা মোপাম্বোতে রাঁদেভুর সঙ্গী হোক, নয়তো ইজ্জত ঢিলে।

এই ইজ্জত ঢিলেতে আজ সর্বনাশের পথ খুলে গেছে, সরস্বতীর শ্বেত শতদল বনে স্বর্ণ-লক্ষ্মীর গজপদ তাড়না চলছে।

অর্থ যার কম, জীবনযাত্রার মান যার সাধারণ সেই যে ব্রাত্য এই ধারণা আজ সব অনর্থের মূলে। বোধ হয় মধ্যবিত্তের ক্ষমতা লাভের যে কাল্পনিক আত্মপ্রসাদ, তা থেকেই এর জন্ম। অর্থ-কৃচ্ছ্রতা—একটা মিনিমাম পর্যন্ত হয়তো সমবেত আত্মত্যাগে স্পোর্টিংলি সহনীয় করে নেওয়া যায়। কিন্তু যদি অঢেল টাকার সঙ্গে থাকে রুগ্না বা মুখরা স্ত্রী, বেয়াড়া বা মূর্খ সন্তান, ঈর্ষা-পরায়ণ নীচমনা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন—ত ম্যানেজ করার কোন উপায় আছে বলে শুনিনি। এক মাত্র উপায় হল প্রফুল্ল নাটকের যোগেশ যে উপায়ে সব ভুলেছিল,—নেশা। অবশ্য আজকে যে নেশার জোরে পয়সাওয়ালা সংসারের কল্পনা ভুলেছে বা ভুলতে চাইছে, তা হল টাকার নেশা অথবা টাকার পিছনে ছোটার নেশা। দিনরাত টাকাকে মীনস্-এর বদলে এণ্ড জ্ঞান করে, তার পিছনে ছুটে আমরা পারিবারিক জীবন দেউলে করে দিচ্ছি। স্ত্রী ফ্রাস্ট্রেটেড, তা হোক খরচের সুবিধা আছে ইচ্ছে মত, ছেলেমেয়েরা বেয়াড়া, এবং উত্তরাধিকারস্বপ্নে উচ্ছৃংখল।

এত সত্ত্বেও অর্থভার জনিত অথবা স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং-এর দায়ে কল্পিত অর্থাভাবজনিত অশান্তিতে জ্বলে আজ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ টাকার জন্য ক্ষেপে গেছে। বলছে ওটা আসলে মীনস্-ই এণ্ড নয়, পরিবারের পক্ষে সামাজিক ইজ্জত আর ব্যক্তির পক্ষে পারিবারিক ইজ্জত অর্জনের মীনস্।

এবং এখানেই আমার প্রতিবাদ। কলকাতার সহরে ৪০ লক্ষ লোকের মধ্যে যদি এক লক্ষও মোটর গাড়ীর মালিক হয়, বাকী ৩৯ লক্ষ লোক যদি ক্ষেপে যায় গাড়ী না হলে আমার ইজ্জত রইল না, জীবন বৃথা, তাহলে, যে ন্যাশনাল ইকনমি দরকার, তা দুর্দান্ত প্ল্যানিং সত্ত্বেও আগামী ৪০০ বছরেও আসবে না। স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং-এর উচ্চাকাঙ্খা কর্ম-প্রেরণা জোগায় বলে যারা প্রচার করেন তারাও একথার প্রতিবাদ করতে পারবেন না। অতএব ৩৯ লক্ষ লোক মোটর চাই বলে পাহাড়ের গায়ে মাথা ঠুকে জীবনপাত করুক। গুপ্ত গুহার দরজা খুলবে না কোন মতে। ৩৯ লক্ষ লোকের জীবনই মাটি হবে তাতে, কি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক দিক থেকে কি সামগ্রিক জাতীয় জীবনের দিক থেকে।

শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী সামাজিক উপন্যাসগুলিতে, এমন কি নাটকেও অর্থই ছিল মূল সমস্যা, অর্থের অভাব নয়, অর্থের লোভ। আর শরৎচন্দ্রে দেখলাম টাকাটা কিছুই নয়। তালসোনাপুরের সাধারণ জমিদারও মৃত্যুর সময় তহবিলে নগদ দুলাখ টাকা রেখে যান।

হারাণ যখন বিনাচিকিৎসায় ধুঁকছে, কিরণময়ী তখনও নিশ্চিন্তে লুচি ভেজে (তখনও দালদার প্রচলন হয়নি) অতিথি আপ্যায়ন করছে। লেখকের মনে প্রশ্ন জাগছে না, খরচ আসছে কোথা থেকে।

আবার শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়ায় যা এল, রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন দারিদ্র্যের দম্ভ। সে দম্ভ কিন্তু দারিদ্র্যজ ক্লেদ নিয়ে মানসিক বিলাসের স্তর পেরিয়ে উঠতে পারেনি, উনিশ শতকের ফরাসী শিল্পীমানসের মত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাহিত্যে দেখা গেল মড়কের ছবি, দারিদ্র্যের জ্বালার তীব্র চিত্র। এ যুগের বাঙ্‌লা কথা সাহিত্য পড়লে মনে হয় দারিদ্র্যের যন্ত্রণা ছাড়া আর কোন সমস্যাই বোধ হয় নেই মধ্যবিত্তের জীবনে। তাই পুঁথি বিলাসী মধ্যবিত্তের আজ বাতিক জেগেছে টাকার অভাবে মরে গেলাম। অথচ মরে যে যাইনি তার প্রমাণ প্রতিদিন মিলছে। না হয়, তা হলেই আমার আরাধনাকে ব্যর্থ বল তুমি কোন ধৃষ্টতায়!

আজ যে ৩৫্ মণের চাল খেয়েও মানুষ অনাহারে না মরে আছে এইটেই প্রমাণ হয় যে টাকার চেষ্টায় আত্মবিক্রয় করার মত অবস্থা নয় অন্তত মধ্যবিত্তের। অনাহারে দুজন মরলেও তা খবরের কাগজের খবর হয়; তার অর্থ কি এই নয় যে ৩৫্ মণ দরেও খেয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক বলে বিবেচিত। তাছাড়া সহরে সিনেমা থিয়েটারে ফুল হাউজ, চালের বাজারে ও কাপড়ের বাজারে সবসময়ে শুধু সুপারফাইনের চাহিদা, মোহনবাগানের ফুটবল বা স্টেটম্যাচের টিকেটের জন্য পরিবার-কে পরিবার ক্ষেপে যাওয়া—এ সবই আজ মধ্যবিত্তজীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন এবং এসবই চাই আমরা আত্মবিক্রয়ের মূল্যে।

মধ্যবিত্তের অর্থাভাববোধ আজ এত বেড়ে গেছে যে সেদিন একদল দুঃখ করে বলছিলেন, মাস গেলে কুল্যে মাত্র ৩১০্ পাই, আফিসে টিফিন খাই কি করে? মুখে যা এল কিন্তু বলতে পারলাম না, তাহল, ভাগ্যিস ওঁর বাবাকে একেলে স্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং-এর ব্যাধি ধরেনি, তাহলে ৪০্ থেকে ১২০্ টাকার কেরাণীগিরি করে তিনি ছেলেকে ৩১০্ উপার্জন করার যোগ্য করে মানুষ করে তোলা তো দূরের কথা, সারাটা জীবন বোধ হয় কলের জল আর কুঁচো চিংড়ী খাইয়ে রাখতেন। আমার জানিত আর একজন, তিনশ টাকা মাইনে পাওয়া তরুণ, তার হাজার টাকায় রিটায়ার করা বাবাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, অল্প উপার্জনে বিয়ে করে তিনি যে ভুল করে-

ছিলেন সে অন্তত তার পুনরাবৃত্তি করবে না।

একটি বন্ধুপুত্র উচ্চশিক্ষান্তে পনেরশ টাকায় চাকরী পেয়েছে, তার সিগ্রেটের খরচ মাসে তিনশ টাকা। এই মূল্যায়ন হয়তো আধুনিক জীবনাদর্শসম্মত। তবু বলবো এও ব্যাধি। বাউ ণ্ডুলে জীবনে নিজের জীবনকে অহেতুক জ্বালিয়ে ছাই করার প্রতীক চাক্ষুষ করার তৃপ্তির জন্য মুখে করে নিরন্তর সিগ্রেট পুড়িয়ে ছাই করার যে নেশা, তা কেন সুস্থ-সুন্দর জীবনে প্রতিষ্ঠিত তরুণকেও গ্রাস করবে। অপচয় যে স্বচ্ছল অবস্থায়ও অভাব আনতে পারে—একথা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। যুবক যদি ওই টাকা থেকে একটা টাকারও বই কিনতো, তাহলে নিশ্চয়ই জীবন সুন্দরতর হত। কিন্তু প্রচলিত ব্যাধির সংক্রমণ থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা না করলে ব্যাধি ধরবেই।

শ্রেণীবিভেদ বিলোপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সমাজেও কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী উপার্জন তথা জীবন-যাত্রার মানের পার্থক্য রয়েছে। ক্রুশ্চেভ যে কাপড়ের পোষাক পরেন, কারখানা শ্রমিকরা সবাই যদি সেই কাপড়ে পোষাক বানাবার জন্য ক্ষেপে যায়, তাহলে ব্যর্থতায় তারা ভেঙ্গে পড়বেই। আর শ্রেণীবিভেদযুক্ত সমাজে—তা ইংল্যাণ্ড আমেরিকা ফ্রান্স, যেখানেই হোক না কেন, জীবনমানের পার্থক্য আছেই। আপামর সাধারণ উচ্চতম স্তরের জীবনযাত্রায় হাত বাড়ালে সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক উভয় জীবনেই বিপর্যয় অনিবার্য। শুনেছি অস্ট্রেলিয়ায় একরকম পাখী আছে যারা ঠুকরে ঠুকরে পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ কেটে এদিক থেকে ওদিকে বার হয়, তার পর ওদিক থেকে গর্ত করে এদিকে আসে; আর এই করতে করতে ঠোঁট ক্ষয়ে মরে যায়। আমরা আজ যদি ওই পাখীর অনুকরণে আর্থিক স্বাচ্ছল্যের পাহাড় ঠোক্‌রাতে ঠোক্‌রাতে প্রাণ দিই, তবে সেই নিষ্ফলা জীবন নিয়ে কী সান্ত্বনা পাব! তার চেয়ে মিনিমাম প্রয়োজনের একটু রুচিসম্মত ব্যবস্থায় তুষ্ট ও তৃপ্ত হয়ে জীবনশিল্পে আত্মনিয়োগ করার সার্থকতা অনেক বেশি। জীবন-যাত্রার স্থূল মানের পাথরে মাথা ঠুকে না মরে যারা জীবনের নেশায় আকুল হইয়া দিকে দিকে ফেরে, তারাই কি সমাজের প্রেরণার উৎস নয়।

অভাববোধ অর্থনৈতিক জীবনে প্রেরণার উৎস একথা হয়ত মার্শালিয়ান অথবা কেন্‌সিয়ান অবাধ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে স্বীকৃত হতে পারে। কিন্তু আজ অল্পবিস্তর দুনিয়ার সর্বত্র চলছে প্ল্যান্‌ড্ ইকনমি, সেখানে এর মূল্য কতটুকু! ভারতবর্ষের সোশ্যালাইজড্ ইক-নমি (হোক তার ভড়ং) এর মূল্য আদপেই নেই।

নেহরুর মুখের বুলি 'কাম বঢ়াও' যেমন আজ অর্থহীন, অভাববোধরূপী মানসিক বিকারও জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির পক্ষে ততখানি অর্থহীন। প্রাইভেট সেক্‌টারে যেখানে বিরাট বিরাট ক্যাপিটালিস্ট প্রমাদ গুণ্‌ছে, সেখানে নকল অভাববোধের প্রেরণায়ই আমি আপনি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়ে উঠবো, কাম বঢ়াবো—এতো বাতুলে প্রলাপ।

অথচ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ছাড়া বড়লোক হবার সমাজসম্মত রাস্তা কই? আইনের মারপ্যাঁচের সুযোগ নিয়ে হয় বিপন্নকে দোহন করে না হয় ক্রিমিনাল বা অন্যায়কারীকে সমর্থন করে অঢেল উপার্জনের যে সুযোগ, বাঙালী মাথাওয়ালা সমাজ তার প্রচুর সদ্ব্যবহার করেছে। কিন্তু আজ আর আইনের জটিলতা রক্ষানির্ভর ওই শোষণকে নীতিসম্মত জ্ঞান করতে রাজী নই আমরা। ডাক্তারী ৬৪ ফি, চুরি ধরার ন্যূনতম ফী ১০০—এও নীতিসম্মত বিবেচিত হতে পারেনা। বই লিখে বা অশোককুমার কিশোরকুমার হয়ে মালটি মিলিওনেয়ার হতেও কজন পারে।

বর্তমান ভারতে সোশ্যালাইড্ সেক্‌টারে অর্থ উপার্জনের একমাত্র পথ গভর্ণমেণ্ট সাপ্লাই।

সে সাপ্লাই-এর সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এত ফাঁক, যে ফাঁক বোজাতে বোজাতে সাপ্লাইটাতেই ফাঁকি পড়বে, নইলে সাপ্লায়ের তো শুধু রথ দেখতে আসেনি।

প্রকৃত ব্যবসা যে কি চীজ তা আমাদের দেশে বুঝেছে নাকি কেউ? ক্যালকুলেশনে যা হয়, তা আজ আর নেই, তার নাম ছিল ব্যবসা। আজ যা ব্যবসা বলে চলেছে তা আসলে স্পেকুলেশান এবং তার চেয়েও বেশী ম্যানিপুলেশান।

এই দুই জাতের ব্যবসায়ের তফাৎ হল ঃ প্রথমটায় (রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায় না) নিষ্ঠা সততা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করতে পারলে তিনশ বছরে হাউজ অব লয়েড্‌স্ হওয়া যায়, নিদেন পক্ষে টাটা হতে হলেও পঞ্চাশ বছর লাগে। পক্ষান্তরে স্পেকুলেশান-কাম-ম্যানি-পুলেশানে যা হওয়া যায়, তা আমরা আজকাল হামেশা দেখছি। বড় বড় মোটরে সাধারণ মানুষের গায়ে কাদা ছিটিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে ঔদ্ধত্যে! পাঁচ বছরে হচ্ছে লাখপতি, দশ বছরে ক্রোরপতি স্বাদশবর্ষে দাঁড়াচ্ছে আসামীর কাঠগড়ায়।

এত দেখে শুনেও বুদ্ধিমান শিক্ষিত সমাজে কেন যে আজ শূন্যগর্ভ টাকার এত ইজ্জত, তা কোন মতে ভেবে পাই না। তোমার টাকা আছে, আমার নেই, ঠিক তেমনি আমার বিদ্যা আছে তোমার নেই; অতএব এই পর্যন্ত না হয় কুইট্‌স্। তোমার রুচি নেই, আমার আছে, তোমার রসবোধ নেই, আমার আছে; তোমার স্নেহ প্রেম কোমল অনুভূতিগুলি ভোঁতা মেরে গেছে আমার তা সতেজ আছে। তোমার এতগুলি দাঁনতা ঢাকার প্রয়োজনে আজ তুমি আমার মনে টাকার নেশা জাগিয়ে, না পাওয়ার অর্থাৎ তোমার পথ অনুসরণ করতে না পারার, অশান্তি সৃষ্টি করে আমার ওপর টেক্কা দিতে চাইছ, তোমার এ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আমি ব্যর্থ করে দেব, এই আমার পণ।

তোমরা হয়তো বলে বেড়াবে, দেখ কেমন টুপাইস করেছি, জীবন আমার সার্থক; আর তুমি লেখাপড়া ও রসের বিলাসে মশ্‌গুল থেকেছ, পারিবারিক জীবনের বন্ধন মেনে নিরর্থক মাধ্যর্ষের সাধনা করেছ অতএব তোমার জীবন ব্যর্থ, কিন্তু শুনে রাখ বস্ তোমার দেবতা ও আমার দেবতা যদি এক না হয়, পূজার ফল পৃথক হবেই। তোমার দেবতা যদি দেন অর্থ আমার দেবতা দেন পরমার্থ, আমার পূজাকে ব্যর্থ ঘোষণা করার ধৃষ্টতা তোমার আমি সহ্য করবো কেন?

চাঁদ সদাগরের পূজা নইলে যেমন মনসার চলেনি, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান সমাজের শ্রদ্ধা না পেলেও টাকাওয়ালা নিরেটদের চলে না। কারণ টাকার জোরে তাকে সমজ্‌দার বলতে হবে, বলতে হবে শিল্পসাহিত্যে রসিক, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের দেওয়া সম্মানের মালা গলায় ঝোলাতেই হবে, নইলে জীবনধন সব বৃথা।

টাকার পঙ্কে খাবি খেয়ে যারা মরতে চায় তারা মরুক। আমরা তাদের কৃপা করবো কিনা সেইটেই প্রশ্ন। কিন্তু ঈর্ষা করবো কোন দুঃখে! জ্ঞান-বিদ্যা ও সত্যসুন্দরের সাধনা বিসর্জন দিয়ে, টাকার সাধনার অভিশাপে যে পড়েছে, তার পাপ পথ কেন পরিহার করবো না।

একথা কেন বলতে পারবো না, আমার অর্থ নেই, আমি তোমার তুলনায় অনেক দরিদ্র একথা জেনে রাখো। তা সত্ত্বেও যদি আমার সাথে মেশবার, আমাকে বন্ধু বলে জ্ঞান করবার মত কিছু পাও তো এস, নইলে বিদায় আমার হউক মঞ্জুর।

তুমি টাকা সম্পর্কে কথা ঠিকমত রাখতে পার, কিন্তু মনুষ্যত্বের অন্যদাবীমত কথা রাখায় তোমার একান্ত অবহেলা। আমি টাকার বিষয়ে কথা প্রায়ই রাখতে পারিনা, কিন্তু মনুষ্যত্বের অন্যদাবীগুলি প্রাণদিয়েও রক্ষা করার প্রয়াস পাই। তোমার টাকার দম্ভে তোমার ভালোমন্দ

বিচারের ওই মাপকাঠি আমার ওপর চড়ালেই আমি তা মেনে নেব কেন!

ভুল মস্ত বড় ভুল। টাকার উপাসনা লক্ষ্মীর উপাসনা নয়, ও কুবেরের পূজা। লক্ষ্মী টাকার দেবতা নন, তিনি সম্পদাধিষ্ঠাত্রী হলেও সে সম্পদের অর্থ শ্রী ও কল্যাণ। আজকের ব্ল্যাক মার্কেটী বা কণ্ট্রাক্টারী বড়লোকদের শ্রীহীন জীবনের অকল্যাণকর প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা তাদের কীর্তিমান বলে ঘোষণা করলেও, তারা লক্ষ্মীমান বলে প্রতিভাত হবে কোন সুবাদে!

অর্থ চাই, হাজার বার চাই; কিন্তু প্রয়োজন মেটাতে এবং তা হবে সুরুচিসম্মত ন্যূনতম প্রয়োজন, উচ্চবিত্তের নকলে নিষ্প্রয়োজন জীবনমান বৃদ্ধির লোভজনিত প্রয়োজন নয়। আর ইজ্জতের লোভে তো কোনমতেই নয়। টাকাওয়ালার ইজ্জত তো আমাদের কাঙালপণার ফল। আমরা ইজ্জত দি বলেই ইজ্জত। নইলে প্রকৃত ইজ্জত পাবার যোগ্য টাকাওয়ালারা নয়। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, রসবোধ ও মসৃণ কোমল প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশ এইতো জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। তাই আজ শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে বলতে হবে টাকাওয়ালা চিনির বলদ হতে চাই না। চাই স্থূল-জীবন পেরিয়ে জীবনের সূক্ষ্মতর অনুভূতিতে উত্তরণের সম্পদ, চাই সমাজের কল্যাণে নিজের স্বার্থ গৌণ করে দেখতে পারার দৃষ্টি। চাই মোটা কাপড়ে, মোটা ভাতে, হাতলভাঙা কাপের চা-য়ে দৈন্যবোধ না করার মানসিক ঐশ্বর্য। চাই সেই ধন, যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মানে না মণি। দারিদ্র্যে লজ্জা নেই, লজ্জা দীনতায়; অভাব কষ্টের নয়, কষ্টের হল অন্যের স্বচ্ছল্য দর্শনে মুখ দিয়ে লালা পড়ায়।

এই যে আজ শূন্যগর্ভ সুবর্ণগর্দভদের আমরা সমাজ শিরোমণি বলে জ্ঞান করছি, টাকার প্রাচুর্যকেই সুখ সমৃদ্ধি শান্তির আকর, জ্ঞানবুদ্ধিরসবোধের মাপকাঠি বলে ধরে নিচ্ছি, আর অর্থকে স্থূল বিলাসকে সুরুচি বলে মার্কা মেরে দিচ্ছ, তার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত অচিরেই করতে হবে সমাজকে।

জাতীয় সম্পদ যেটুকু বাড়ছে, তার চেয়ে খাঁকতি বাড়ানো মানেই অপরের অংশ কেড়ে নেওয়া এবং স্বভাবত দুর্বলের অংশ কাড়াটাই সহজ। তাই কণ্ট্রাকটারের ঐশ্বর্য গড়ে ওঠে জনসাধারণের শোষণের উপর।

আজ বিজ্ঞান-প্রয়োগবিজ্ঞান ও মানবতার ভিত্তিতে যে নতুন দুনিয়া গড়ে উঠছে, সেখানে কাড়াকাড়ি বা কম্পিটিশান নয় সহযোগিতা বা কো-অপারেশানই মূল নীতি। ব্যক্তিস্বার্থ নয় সামগ্রিক কল্যাণ-ই মূল লক্ষ্য। আর তার প্রেরণাও তাই আসবে অভাববোধজনিত ঈর্ষার তিক্ততা থেকে নয় আত্মবিশ্বাস ও পরিতৃপ্তি থেকে, গভীর জীবন দর্শন থেকে।

পাটোয়ারী বুদ্ধি নিয়ে যারা বাড়ী গাড়ী ব্যাঙ্কব্যালেন্সকে সর্বস্ব জ্ঞান করছে, সর্বস্ব ঢেলে দিচ্ছে ঐশ্বর্যের পায়ে, তারা কোন ক্ষতি করতে পারত না সমাজের, যদি পাবলিক ওপিনিয়ান, যা হল ওপিনিয়ান অব্ দি মোস্ট ডোমিন্যাণ্ট সেকশান অব্ দি পাব্লিক অর্থাৎ এদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তাদের সম্পর্কে কাঙালপণা না করতো, ইমিনেশানরূপী চূড়ান্ত ফ্ল্যাটারী করতে গিয়ে, নিজেদের জীবনে তিক্ততা ও ব্যর্থতা ডেকে না আনতো। একটা স্তরের নিচে দারিদ্র্যের জ্বালা অসহনীয় নিশ্চয়ই, কিন্তু মিলিওনেয়ার হবার নেশাও কম সর্বনেশে নয়।

রাখাল ভট্টাচার্য

আ লো চ না

আধুনিক কবিতা সমালোচনা প্রসঙ্গে

বাঙ্লা কাব্যের ধারায় আধুনিক কবিতার জন্ম সাম্প্রতিক কালের ঘটনা; তাই তার গতি-প্রকৃতি নিয়ে বাদানুবাদের বাত্যা সংক্ষোভ আজও পুরোপুরি কাটেনি। বহু সমালোচকের লেখনী এখনো সাহিত্যের এই শাখার উপর খড়্গহস্ত। তথাপি বোলতে দ্বিধা নেই, বিংশ শতাব্দীর এই মধ্য দশকে আমাদের সাহিত্য জীবনে আধুনিক কবিতাকে মেনে নেবার দিন এসেছে; এবং এ কথাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হতে চলেছে যে আধুনিক কবিতাও কবিতা, এবং মহৎ কাব্য-রচনার প্রতিশ্রুতি আধুনিক রুচিতেও বর্তেছে; তাই শুষ্ক বিরোধীতার পরিবর্তে প্রাজ্ঞ বিবেচনার কথা এখন অনেকেই ভাবছেন। গত কয়েক বৎসরে তাই আধুনিক কবিতার উপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। তথাপি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ভ্রান্তিমূলক আলোচনাদি এখনও বন্ধ হয়নি; আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে এইটাই মনে হয় মৌল সমস্যা। মন-গড়া তত্ত্ব-তথ্যে আধুনিক কবিতার মত দুরূহ, সূক্ষ্ম ও গভীর কাব্যাদর্শের বিচার কোরতে গেলে ভ্রান্তি অনিবার্য। এবং এই ভ্রান্তি থেকেই স্বাভাবিক কারণে কবিতা পাঠকেরও অনীহা উদ্ভূত হয়ে থাকে। আবার আধুনিক কবিতা এমন একটি অনন্য ভাবিত আদর্শে গঠিত যে সিদ্ধ কাব্য-মীমাংসার নানা সূত্রেও একে সরাসরি যাচাই কোরতে যাওয়া মহাভুল হবে। এবং পাশ্চাত্য মনীষা ও কাব্যান্দোলনের যথেচ্ছ স্মরণ নিলেও এর জটিলতার লক্ষ্য ভেদ সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। আসল কথা, পূর্বে যে বিশেষ ধারায় কবিতার পঠন, পাঠন ও রস-চর্চা চোলতো বর্তমানে সেই ধারাই অনেকাংশে পালটে গেছে; জীবনের নতুন মূল্যায়ন ও উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সংস্কার ও বিশ্বাসও পালটাচ্ছে; যুগ চিন্তার অনুধ্যানে পাঠকের সনাতন বাসনালোকেও নব নব অনুভবের প্রবেশ ঘটেছে বর্তমানে। কবিতা আজকাল অংশত তাই স্বাধীন, বন্ধনহীন, তাঁদের কবিতাও স্বেচ্ছাতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত। এক কথায় কবির দায় এখন কমেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে সমালোচকের দায়িত্বও কি হ্রাস পেয়েছে? না!—তা কমেনি একতিলও। বরং বেড়েছে। সিদ্ধ রসবোধের স্থির মাপকাঠিতে আজকাল আর অর্বাচীন কাব্যের বিচার চলেনা; প্রাচীন অলংকার-শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মৎ-ফারাক্কা রায় দেবার দিনও সেই সঙ্গে গত হয়েছে। আগে যে কর্তব্য ছিল প্রথা-সিদ্ধ, মসৃণ ও সরলগম্য বর্তমানে নানা প্রশ্ন, তর্ক ও মননের কূটতায় তাই হয়েছে দুরধিগম্য। একদা রিচার্ডসন কাব্য-সমালোচকের সহমর্মীতা, অভিজ্ঞতা বোধ, মূল্যবোধ প্রমুখ যে ত্রিবিধ গুণের কথা উল্লেখ করেছিলেন বর্তমানে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাই আরো নানা মানসিক প্রস্তুতি; নেতি নেতি করে তার বিচার কোরতে গেলে বিপুল মহাভারত গড়ে উঠবার সম্ভাবনা। মোটামুটি ভাবে বলা চলে, হৃদয়বান রসিক,প্রাজ্ঞ বিবেচক, কূট তার্কিক এমনকি অক্লান্ত জ্ঞানার্থীর মানসিক সমীকরণও আধুনিক

কবিতা বিচারের পক্ষে কাম্য; সূক্ষ্ম অনুভূতি ও গূঢ় মনন এই উভয়ের সংক্রামে পাঠকের চিত্তে যে মিশ্র-রস সঞ্চারিত হয় তাই আধুনিক কাব্যের স্থায়ী রস; এবং এই রসে পরিশীলিত সহৃদয়ই আধুনিক কবিতার যথার্থ সমালোচক হতে পারেন। প্রগাঢ় মনীষা, সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা ও চেতনাবৃত্তি এবং গভীর সমাজাভিজ্ঞতাই আধুনিক কবিতা বোঝা ও ব্যাখ্যার পক্ষে আদি-গুণ। এর কোনটির অভাব থাকলেই সে সমালোচনা অগভীর, অসম্পূর্ণ অথবা একদেশদর্শী হতে বাধ্য। কবিতা আলোচনা-কালে যে কোন প্রকার 'বায়াস'ও সর্বদা পরিত্যাজ্য। কোন প্রকার সাহিত্যিক-গোঁড়ামীই কাব্যালোচনার অনুসঙ্গি হওয়া উচিত নয়। এ ছাড়া অকপট প্রত্যয় ও উপযুক্ত বোধির রসায়ণই গঠনধর্মী সমালোচনার জন্ম দিয়ে থাকে। এবং হার্বার্ট রীড্ একদা যে সমালোচনা ভঙ্গিকে—'সিম্প্যাথি এ্যান্ড এমপ্যাথি—ফিলিং উইথ এ্যান্ড ফিলিং ইন্টু'—বলে আখ্যাত করেছিলেন তা'ও এই বিশেষ গোত্রের। এই সহানুভূতি ও গভীরানুভূতি কাব্যালোচনার প্রধান এবং প্রসিন্ধ গুণ।

উপরোক্ত কথাগুলি আমার মূল-বক্তব্যেরই গৌরচন্দ্রিকা। আধুনিক কবিতা কি এবং কেমন তা' আলোচনা করার পূর্বে কবিতা-সমালোচন রীতি নিয়ে সাধারণভাবে বাধ্য হয়েই দু'চার কথা বোলতে হয়। কারণ বর্তমানের কবিতা একাধারে জ্ঞান, বিস্ময়, বেদনা ও আবেগের বার্তাবহ। তা' কেবল মাত্র রসিক-মনোহারিই নয়, চিন্তারও বাহন। শুধু শ্রব্য নয়—চিন্ত্যনীয়, কখনো দর্শণীয়ও বটে; সান্দ্র-উচ্চারণে তাকে শুধু পাঠ করলেই চলে না গভীর মননে তাকে অধিগতও করতে হয়। এহেন কবিতার সমালোচনা-রীতি যে অসাধারণ হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? শুধু তাই নয়, কাল ও কলা, মন ও মননের যথাযথ কর্ষণে আধুনিক কবিতার পটভূমিও নানা শস্য-শালিনী। তার উৎস জটিলতাবহুল, তার জটিলতা মনন-বহুল এবং তার মনন সমাজ জীবনের নানা অভিঘাতেরই ফলশ্রুতি। আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে, প্রতিপাদ্যে, বাচ্যে ও ব্যঙ্গ্যে সর্বত্রই তাই দুরূহতার অগ্রাধিকার। এ ছাড়াও, নানা বিদেশী কলাবিধি ও কবি-বিশ্বাসের অনুপ্রেরণাও আছে এর পশ্চাতে। আছে সমাজ জীবন ও ব্যক্তি জীবনের নানা পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী বিক্রিয়া। তাই এবংবিধ কাব্যধারাকে যথেচ্ছ বিশ্লেষণে অপমানিত করা অযুক্তিযুক্ত।

আধুনিক কবিতার আলোচনা কালে প্রত্যেক সমালোচককে এছাড়া আরও নানা মুখ্য সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। যে সমস্যাটি সব চেয়ে ব্যাপক তা হচ্ছে এর অবিকল সংজ্ঞা নির্ধারণ। 'আধুনিক' শব্দটি এমনই দ্ব্যর্থক ও ব্যাপক যে এর সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা অতি দুরূহ। আধুনিক বহুলাংশে আপেক্ষিকও বটে। শেলী, কীটস তাঁদের যুগে যে অর্থে আধুনিক ছিলেন ঠিক অনুরূপ প্রত্যয়েই আমরা বোদ্লোর—র‍্যাঁবো কি ভেরলেনকে আধুনিক বলে থাকি; আবার সাম্প্রতিক কালে এলিয়ট-ইয়েটস্-স্পেন্ডার-সেট্ওয়াল ঠিক এই কারণেই আধুনিক। অর্থাৎ প্রতি যুগে যাঁরাই নব নব উন্মেষশালী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাচীন-পন্থায় অনীহা প্রকাশ করেন তাঁরাই আধুনিক বলে গণ্য। এবং ঠিক এই ধারণাতেই নবতন রেঁণাশার প্রবর্তক বলে মাইকেল-বঙ্কিম যেমন শ্রদ্ধেয়,রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মোহিতলাল, জীবনানন্দ ঠিক অনুরূপ কৃতিত্বেরই দাবীদার। তাহলে সমস্যাটি ক্রমশই গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবে এর একটি সমাধানও আছে। 'আধুনিক' শব্দটিকে আমরা যদি কালবাচক অর্থে না ধরে গুণবাচক হিসাবে ধরি তবে হয়ত এ সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়; বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রত্যয় চিহ্নিত কাব্য ধারাকে পৃথক পৃথক রূপে ভাগ করলে সমালোচকের অন্বিষ্ঠ যুগ পাওয়া দুরূহ হয় না। এবং সেই যুগ

পর্যায়ে যা সাম্প্রতিকতম তাকেই আধুনিক আখ্যা দেওয়া চলে। সে চিহ্ন আপেক্ষিক হলেও সাহিত্যের পরিভাষায় স্থায়ী। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বিবেচ্য। অধুনা রচিত হলেই যে তা' আধুনিক হবে তার কোন মানে নেই। অনেক কবি আছেন যাঁরা প্রাচীন পন্থায় আস্থাশীল যাঁরা যুগ ক্রান্তির অনিবার্য বয়ঃসন্ধিকে কাব্যে স্বীকার করেন না; বরং বহু-ব্যবহৃত ও ঐতিহ্য-লগ্ন প্রাচীন কাব্যাদর্শেই তাঁরা নিয়ত বিশ্বাসী। তাই কালিদাস রায় ও সমর সেন একই যুগে জন্ম লাভ কোরলেও কাব্য বিশ্বাসে তাঁরা সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির অধিবাসী। এবং আধুনিক কবিতা আলোচনা কালে তাই প্রথমেই আমাদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এবং আলোচনার পরিধিকেও যথোপযুক্ত সঙ্কীর্ণ ও কেন্দ্রায়িত রাখতে হবে। কোন কোন সমালোচকে আর একটি ভুলও করে থাকেন। অতি-আধুনিক অর্থে তাঁরা প্রয়োগ করেন 'সাম্প্রতিক' শব্দটি। কিন্তু তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন না যে 'সাম্প্রতিক' আধুনিকেরই প্রতি-শব্দ। 'অধুনা' ও 'সম্প্রতি' একই শব্দের এপিঠ-ওপিঠ। আধুনিক কাব্য আর যাই হোক না কেন তা' নিঃসন্দেহেই কথার মারপ্যাচ প্রকাশ করার নয়।

এখনো তবু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে কালক্রমণে আধুনিক কবিতার স্থান কোথায়। সমালোচকের দায়িত্ব তাই এখানেও শেষ নয়। 'মডার্ণে'র সীমানা একদা রবীন্দ্রনাথ টানতে চেয়েছিলেন নদীর সঙ্গে কবিতার তুলনা করে; কিন্তু নদীর বাঁক আর কবিতার আধুনিকতায় তুলনা চোললেও ব্যাখ্যা হিসাবে তা' দুর্বোধ্য। তাই সমালোচককে এক্ষেত্রে অগত্যা ইতিহাসের স্মরণ নিতে হয়। উৎসারণ কালের দিক থেকে আধুনিক কাব্যকে না হয় মহাযুদ্ধ—পরবর্তী বলা গেল কিন্তু ভাবের দিক থেকে এর প্রেরণার উৎস ভূমি কোথায় তা' অনুসন্ধান করা আরও দুরূহ। 'রবীন্দ্র প্রভাব-মুক্ত, অন্তত মুক্তি প্রয়াসী' এই জাতীয় অতি ব্যাপক সংজ্ঞা আজ কাল অবশ্য চোলছে। কিন্তু আধুনিক কবিতার যথার্থ উদ্দেশ্য ও চরিত্র তা'তে ধরা পড়ে কি? কালধর্ম (ট্রেডিশন) এবং যুগধর্ম (রিয়লিটি) এই দুয়ের সমন্বিত রূপ যাতে প্রতিফলিত, যার মধ্যে শতাব্দীর আনন্দ-বেদনা-আক্ষেপ অপেক্ষমান সেই আধুনিক কাব্যের মর্জি ও কলাবিধি নিঃসন্দেহেই রাতারাতি গড়ে ওঠেনি; এবং আধুনিক কবিতার প্রেক্ষিতে প্রৌঢ় এবং আধুনিক রবীন্দ্রনাথের অবদানও নিশ্চয় কম নয়। তাঁর চিন্তা, তাঁর সিদ্ধান্ত, তাঁর প্রতিক্রিয়া ও পদক্ষেপ অনুসরণ করেই আধুনিক কবিতা আজ জগতে উঠেছে। তিনিই আধুনিক কাব্যের সীমা এবং সুরু একথাও সবাই জেনে নিয়েছেন। তাই আধুনিক কাব্য রচনার প্রস্তুতি যে বেশ কিছুকাল আগে থেকেই চলছিল একথা অনস্বীকার্য। এবং রবীন্দ্রনাথেই যে তার প্রথম বিকাশ এবং বিস্তার ঘটেছিল একথা না মেনে উপায় নেই। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথকে না হয় পথিকৃৎ হিসাবে ধরা গেল কিন্তু তাঁর উত্তর সাধকদের মধ্যে দ্বিতীয় নেতা কে এই নিয়েও অমিত বিতর্ক; রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে তাঁর মত অভিযোজনক্ষম এবং সদা পরিবর্তমান আধুনিকতা খুব কম কবিই দেখাতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর তিরোধানের পর তাঁর আঁচল-ধরা বাঙলা কবিতা সহসা এত অসহায় হয়ে পড়েছিল যে তৎকালে 'অগ্রজের অটল বিশ্বাসে' কে যে অবিচলিত থাকতে পেরেছিলেন তাও এক মহাপ্রশ্ন। এবং আধুনিক কবিতার উৎস সন্ধানে এই প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথের পর কে যে প্রথম নতুন তা' সমালোচকদের কাছে আজও একটা অস্বস্তিকর সমস্যা হয়ে রয়েছে। আধুনিক কাব্যের উদ্দেশ্য-প্রকরণ নির্ধারণ কালেও অনুরূপ বিপদে পোড়তে হয়। সর্ববিধ প্রথা লঙ্ঘন যে কাব্যের মৌল-লক্ষণ তার স্থির-নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা যে

কি দুরূহ তা' বোঝা যায় তখনই। সাম্প্রতিক কালের যে বিশিষ্ট, বহু বিভাজিত চেতনা, প্রত্যয় ও অনুভব আধুনিক কাব্যের উপজীব্য তা'র জটিলতাও সর্বজনবিদিত। প্রচলিত ভাবধারা, কাব্যাদর্শ ও জীবনের প্রতি সচেতন বিদ্রোহের বশে কবিরা এই যে পথ বেছে নিয়েছেন তার দুর্জ্ঞেয়তা তাই একেবারে মূলেই নিহিত। স্নিগ্ধ সামাজিক সম্বন্ধ ও পূর্ব নির্দিষ্ট মূল্যবোধে অবিশ্বাস, অকারণ ও সকারণ পাণ্ডিত্যন্যাস, আত্মবিরোধ, মনস্তাত্ত্বিক বিক্ষেপ ও চিন্তা, সর্বোপরি জীবন ও জগতের সমন্ধে নির্লজ্জ, খোলাখুলি অভিভাষণ আধুনিক কাব্যে প্রায়শই দেখা যায়। এছাড়া ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, দুর্জ্ঞেয়, দুর্লভ এবং অপাংক্তেয়ের প্রতি অতি-পক্ষপাত তো আছেই। কিন্তু আধুনিক কাব্যের এ সমস্তগুলিই জটিল আবরণ মাত্র; তা'র উদ্দেশ্যের স্বাক্ষর এর কোনটির মধ্যেই নেই। প্রকৃতপক্ষে 'আধুনিক কবিতা এমন কোন পদার্থ নয় যাকে কোন একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকল ভাবে সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা....।' * এহেন কাব্যকে সীমিত উদ্দেশ্যের শৃংখলে কে বাঁধবে? আধুনিক কবিতার বিচারে আবার যা' দ্বিতীয়-অন্তরায় তা' হচ্ছে এর গঠন-রীতি বা আঙ্গিক। বর্তমানে কবিরা তাঁদের কাব্যে 'লজিক্যাল সিকোয়েন্স' এর পরিবর্তে 'ইমোশ্যানাল্ সিকোয়েন্স' কেই অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আবেগ ও অনুভবের ন্যায্যতা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না আবেগের তীক্ষ্নতা ও খাঁটিত্ব নিয়েই তাঁদের যত মাথা ব্যথা। তাঁদের মতে, যা বুঝবো, জানবো, দেখবো এবং অনুভব কোরবো কবিতার ভাষায় কিম্বা আটপৌরে আলাপের ভাষায় যথাযথ তার বিবৃতি প্রদান কোরতে পারলেই হল, তার মধ্যে যুক্তির এবং নীতির পারম্পর্য যে সর্বদা থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। এই জাতীয় আবেগ বাহিত কবিতা বোঝা যে কি দুষ্কর তা' সচেতন পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এইখানেই শেষ নয়; আধুনিক কাব্য সমালোচককে আজকাল অলঙ্কার, দর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানেও পাঠ নিতে হয়। বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কারসমূহও তাঁকে না জানলে চলে না। আসল কথা, আধুনিক-মানসের ও জীবনের অনুকূল সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতিই সমালোচকের কাম্য। এমন কি, আজ পর্যন্ত সমাজ ও জন-জীবনের উপর যতপ্রকার রাজনৈতিক অভিঘাত এসে পড়েছে আধুনিক কবিরা কবিতায় সেগুলিও ইতস্তত ব্যবহারের পক্ষপাতী। এবং কবির উপর এই রাজনীতির প্রভাব ইমেজিজম্, ইম্প্রেশানিজম্, দাদাইজম্ ইত্যাদি অমূর্ত কাব্যাদর্শের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। প্রখ্যাতা লেখিকা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাঁর 'আর্টিষ্ট এ্যাণ্ড পলিটিক্স্'-প্রবন্ধের একস্থানে বোলতে বাধ্য হয়েছেন—it is clear that the artist is affected as powerfully as other cilizens when society is in chaos, although the disturbance affects him in different ways. কবিদের কাব্যে সমাজজীবনের নানা প্রতিক্রিয়ার (রাজনীতির?) এই প্রতিফলন অবশ্য ভিন্নতর প্রতীকে ব্যক্ত হয়ে থাকে; সমাজ জীবনে যিনি ভীত, ব্যর্থ, বঞ্চিত, খণ্ডিত কবিতার জগতেও তাঁর মূর্তি তদনুরূপ হতে বাধ্য। তবে সে বঞ্চনা ও পরাজয়ের চিহ্ন ঢেকে দেবার জন্যে কবিদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই! তবু আবরণ সত্ত্বেও তা' মাঝে মাঝে প্রকাশ পায় বৈকি। তিরিশের

* বুদ্ধদেব বসু। আধুনিক বাংলা কবিতা, পৃঃ ১০

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ও মহাযুদ্ধের কালে আধুনিক কবির মনন ও অনুভূতি যে আশ্চর্যজনক ভাবে ধ্বংসাত্মক, অনাস্থা ও অসূয়াবাদী হয়ে উঠেছিল তা' ঠিক এই কারণেই। অন্তরের গ্লানি তাঁরা নানা মনস্তাত্ত্বিক প্রতীকের আশ্রয়েই তখন ব্যক্ত করেছিলেন। সে যুগের সর্বাগ্রগণ্য কবি এলিয়টও তাঁর 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' কাব্য গ্রন্থে তাই ঊষর, বিবেক ও ভবিষ্যৎহীন জগতের কথা বলেছেন প্রতীকের মারফৎ। চারিদিকের ব্যর্থ পৃথিবীকে বর্ণনা কোরতে গিয়ে তিনি নানা সংকেতের আশ্রয় নিয়েছেন; যথা

A heap of broken images, where the sun beats
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief
And the dry stone no sound of waters.

এই সংকেত ও প্রতীক আধুনিক কবির অন্যতম অবলম্বন।

যুদ্ধোত্তর কালের কাব্যের মত বর্তমান যুগের কবিতার তির্যকতাও সামাজিক পরিস্থিতি থেকে জন্ম নিয়েছে। নানা অসম্পূর্ণতায় খণ্ডিত, অসুস্থ জীবনে অভ্যস্ত মানুষ কবিতার মুকুরে আজকাল যে ছবি দেখছেন তা' স্বীয় অব্যবস্থ মনেরই ছবি। অতৃপ্ত কাম কবিরা অতৃপ্ত মন ও ইন্দ্রিয় নিয়ে যে কবিতা লিখছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার অনুভূতিও বিশ্বস্ত নয়—ধার করা। আবেগের তীব্রতা দিয়ে মানসিক দীনতা ও অজ্ঞতাকে ঢাকতে চাইছেন তাই কবিরা। ফলে দুর্বোধ্যতা সকারণেই প্রশ্রয় পাচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক কবিকুল প্রেম, প্রকৃতি প্রভৃতি কোমলাদি-বিষয়ের প্রতিবেদনেও তীব্রতা ও কার্কশ্য পন্থী। কাব্যের অবয়বত্বের প্রতিই তাঁদের পক্ষপাত। ললিত উপভোগ্যতা তাঁরা এড়িয়ে চলেন। কল্যাণবুদ্ধির পরিবর্তে অসূয়া, প্রেমের পরিবর্তে দেহজ ক্ষুধা, সমাহিতির পরিবর্তে অনিকেত উদ্‌ভ্রান্ততার প্রয়োগ দেখি তখন আশ্চর্য হইনা। কিন্তু আশ্চর্য না হলেও এই জাতীয় বীভৎস, বিতর্ক ও ব্যঙ্গ রসের বহুল ব্যবহারের জন্য ব্যথিত হই। যিনি সমালোচক তাঁকে কিন্তু এই কুটতম বিষয়ও চেখে দেখতে হয়; এমনকি তার কাব্যত্বও যাচাই কোরতে হয়। সব শেষে আধুনিক কবিতার ভাষাগত দুরূহতার কথা বলা বাহুল্য মাত্র। অবশ্য কবিরা বলেন, এই বিংশ শতাব্দীতে, কডওয়েলের ভাষায় যেখানে সংস্কৃতির নাভিশ্বাস্ উঠেছে, সেখানে 'ললিত গীতি কলিত কল্লোল' একান্তই কাব্যের ভাষা হতে পারে না। অন্তত যুগ জীবন ও যন্ত্রণার চারিত্র গুণ প্রকাশের পক্ষেও দুর্বোধ্যতা কাম্য। তাঁরা এলিয়টেরই কথা উদ্ধার করে বলেন Our Civilization Comprehends great variety and complexity playing upon a refined sensibility, must produce various and complex results. অর্থাৎ কাব্যে জীবনের বৈচিত্র্য ও জটিলতা প্রতিফলিত কোরতে হলে আঙ্গিকের উপরেও তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সমালোচকের পক্ষে কবিতার অঙ্গের এই জটিলতা ভেদ করা আদৌ সহজ নয়। ভাষার ক্ষেত্রে কবিদের দেশজ ও আভিধানিক শব্দপ্রীতিও বহুস্থানেই নির্লক্ষ্য প্রতিভাত হওয়া স্বাভাবিক। শুধু ভাষা নয়, কবিরা ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রেও দুরূহতার পক্ষপাতী। অবশ্য মহৎ কবিতার ব্যঞ্জনা যা language with in a language যা আধুনিক কাব্যের পরিভাষায় 'মিসিং মীট' তা চিরকালই মার্জিত হৃদয়গম্য; তথাপি অভিধা বা লক্ষণার সাহায্যে সেই ব্যঞ্জনা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা বিশেষ কঠিন। এবং রূপকল্পের ভাষার তা ব্যক্ত করা কঠিন। আধুনিক কাব্য বিচারেও মনে হয় এই গূঢ়তা উন্মোচনই সব চেয়ে কঠিন কর্ম।

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা

কথা হচ্ছিল সংস্কৃতি নিয়ে। বন্ধুটি বলছিলেন সভার শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি আমরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমার্ধে সাহিত্যসভার যা কিছু কাজ। অভিনন্দন পত্র পাঠ, সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ওপর কয়েকটি ভাষণ। দ্বিতীয় অর্ধে শুরু হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। একটি কথা জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না। বললাম—আপনারা জীবন থেকে সংস্কৃতিকে এরকম ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে চাইছেন কেন? সাহিত্য তো জীবনেরই এক মন্ময়রূপ। আর সংস্কৃতি তো অর্কিডের মত মানুষের জীবনেরই ওপর গড়ে উঠেছে। বন্ধুটি বুঝতে পারলেন না, অথবা বুঝলেও ঠিক উপলব্ধি করতে পারলেন না।—'এহ বাহ্য আগে কহ আর।' আমি বললাম সাহিত্য কি সংস্কৃতিরই একটা অংগ নয়? শুধু বিচিত্রানুষ্ঠান কি সংস্কৃতি? সংস্কৃতির মর্মার্থ যদি তাই বুঝে থাকেন, তাহলে বলব বড় অব্যাপক হয়েছে আপনাদের বোঝা আপনাদের উপলব্ধি। বন্ধুটি কোন উত্তর দিতে পারেন নি।

'সংস্কৃতি' সম্বন্ধে আজকের এই অব্যাপক ধারণা আমাদের সংকীর্ণ মনেরই ফসল। একটা যুগ ছিল যখন 'সংস্কৃতি' সম্বন্ধে কোনরূপ কেন্দ্রস্থ ধারণা আমাদের মনে বাসা বাঁধেনি। সংস্কৃতিকে আমরা জীবনের এক অখণ্ড প্রকাশ রূপেই দেখেছিলাম। তাকে যে খণ্ড করে দেখা যায়, তাকে যে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, এ বোধ সেদিন আমাদের মনে কিছুতেই গড়ে ওঠেনি। তাই মধ্যযুগের বাঙালীর সংস্কৃতির পরিচয় শুধু মাঝি-মল্লার সারিগানে শুধু লোক-সংগীত আর ললিতকলার মধ্যে নেই। সেই সংগে আছে মঙ্গলকাব্য আর পদাবলী সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে, তার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনসাধনার প্রতিটি পর্বে। এককথায় মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভাবে মধ্যযুগের বাঙালীর ইতিহাস।

সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই ধারণা বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত আমাদের মনে বলবৎ ছিল কিন্তু উত্তরমহাযুদ্ধকালে গোটা সমাজ বন্ধনটা যখন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল, যখন নিদারুণ অবক্ষয়ের মাঝে যুগ ও জীবনের আর্ত-যন্ত্রণা মুক্তির আশায় বার বার আশ্রয়ের সন্ধানে ফিরেছিল তখন মানুষের পূর্বতন জীবনবোধের ঘটেছিল পরিবর্তন। এই হতাশা ব্যাধিজর্জর রুগ্ন সমাজের গ্লানি থেকে সে কি করে ক্ষণিকের মুক্তি পাবে এটি ছিল তার একমাত্র সমস্যা। জড়বাদী সভ্যতা সে মুক্তির উপায় বাতলে দিল। অতি স্বল্পমূল্যে সে মানুষের সামনে মেলে ধরল আদিম প্রলোভন। যা দর্শনীয় তা মানুষকে সব সময়েই অধিকতর আকর্ষণ করে। তাই এ প্রলোভন এল চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে। প্রচুর খোরাক মিলল স্নায়বিক উত্তেজনার, আদিম রিপু চরিতার্থতার। মরফিয়ার নেশায় যে অবসাদ, যে আত্মতৃপ্তি—যন্ত্রণা থেকেই তার জন্ম।

চিকিৎসা শাস্ত্রে একরকম রোগের নাম আছে—যে রোগ মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে হলুদ করে দেয়। এই রোগাক্রান্ত মানুষ যা দেখে তা-ই এই বিশেষ রঙে রঙীন। তার স্বচ্ছ ও ব্যাপক

দৃষ্টির পরিবর্তে আসে এই রুগ্নসংকীর্ণতা। চলচ্চিত্রেরও আছে মানুষের চোখে এই মোহাঞ্জন লাগাবার ক্ষমতা। তার মধ্যে যে মাদকতা আছে তা মানুষকে শুধু আচ্ছন্নই করে না—প্রচ্ছন্নও করে। তাই সংস্কৃতির এক অংগ হিসাবে চলচ্চিত্র যখন এল তখন মানব সংস্কৃতির এক নূতন ধারার প্রবর্তন শুরু হল বলে যারা মঙ্গলশঙ্খ হাতে করেছিলেন—নিদারুণ বিস্ময় ও বেদনার মধ্য দিয়ে তাঁদের একদিন শুনতে হল—এ সংস্কৃতি বলছে 'এক থেকে আমি বহু হব না একের মধ্যেই আমি বহুকে আনব।' রূপকথার রাক্ষসী, ছলনাময়ী সুন্দরী নারীর রূপ ধরে রাজার মন ভুলিয়েছিল এবার তার স্বরূপ হল প্রকটিত। সর্বগ্রাসী এই সংস্কৃতির সাশব্দ পদ-সঞ্চার হল শুরু।

আজ তাই সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। কারণ চলচ্চিত্রের এই অপ্রতিরোধ্য প্রভাব আমাদের জীবনের মজ্জায় মজ্জায় এমনভাবে মিশে গেছে যে আমরা ইন্দ্রিয় বিলসনকেই সংস্কৃতি বলে ভুল করছি। স্থূলতাকেই মনে করেছি লালিত্য, নগ্নতাকেই মনে করছি সৌন্দর্য, কদর্যতাকেই মনে করছি বাস্তব। আমরা হয়ত গণ্ডীটাকে কিছুটা ব্যাপক করেছি, গণ্ডীর মধ্যে সকলকেই টেনে এনেছি, গ্রাস করেছি সকলকে, কিন্তু গণ্ডীটাকে পেরোতে পারিনি। 'রক্তকরবী'র রিক্ত-ক্লান্ত রাজা যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, সে দীর্ঘশ্বাসের সংগে আমাদের প্রাণের আত্মীয়তা অনুভব করছি যেন আজ।

চলচ্চিত্র গ্রাস করেছে সাহিত্যকে, সংগীতকে, শিল্পকে এমন কি সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনকেও। এককথায় গোটা মানুষটা এই সর্বগ্রাসী সংস্কৃতির উদরে তলিয়ে গেছে।

মহাযুদ্ধ মানুষকে উৎকেন্দ্রিক করেছে, পুরোমাত্রায় বস্তুতান্ত্রিক করে তুলেছে। তার জীবনে আজ না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ। জীবনের আশ্বাস তার নেই—শুধু দীর্ঘশ্বাস আছে। লালিমা নেই আছে শুধু কালিমা। জীবনকে আস্বাদ করবার সময় সে পায়না—তিনটে ছ'টার শোয়ে শুধু জীবনকে চেখে নেবার সময় সে করে নেয়। আহারের জন্য প্রয়োজন হয় বিচিত্র উপচার—পঞ্চব্যঞ্জন, কিছু চাখবার জন্য শুধু চাটনি হলেই চলে। আর অগ্নিমান্দ্য হলে সমস্ত পদ আহারের পূর্বেই চাটনির আশ্রয় নিতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে তাকে মুখরোচক করে তুলতে হয়।

সাহিত্য থেকে কবিতার ছুটি মিলেছে অনেকদিন। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী যে গদ্যময় হতে পারে একথা আমি অস্বীকার করি। কারণ পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যের জন্ম ক্ষুধার রাজ্য থেকে হয়েছে। কবিতার যেখানে নির্বাসন সেটি ক্ষুধার রাজ্য নয়—অগ্নিমান্দ্যের রাজ্য। কবিতার জন্য হৃদয় চাই, অনেকখানি অবসর চাই, সৎসাহিত্য পাঠের জন্য অনেকখানি প্রজ্ঞা চাই, বৈদগ্ধ্য চাই। কিন্তু সময় নেই। অনুভূতি সময় চায়, ইন্দ্রিয় চায় না। তাই আজকের দিনে যে সাহিত্য আমরা চাই তা পড়বার নয় পাতা ওলটাবার। গ্রন্থাগার বা গৃহকোণে বসে দেখবার নয়—ট্রেনে ট্রামে যাওয়া আসার ফাঁকে চোখ বুলাবার। এ অভাব মেটাতে পারে চিত্রতারকাদের সচিত্র ছবির এ্যালবাম, স্টুডিও চত্বরে ঊর্বশী-মেনকা-রম্ভাদের রসালাপের কাহিনী। তাই আজ সাহিত্যের বাজার জুড়ে এই সচিত্র পত্রিকার জলসা। গল্প-উপন্যাসের মধ্যদিয়ে করুণসুরে চিত্রপরিচালকের আকর্ষণ করবার আর্তস্বর আজ সাহিত্যের বাজারকে মুখরিত করে তুলেছে।

সমাজ জীবনও ক্রমশঃ একমুখী হয়ে উঠল। ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ যদি সত্য হয়, তাহলে তরুণ-তরুণীদের অবচেতন মনে চিত্রতারকা হওয়ার অবদমিত ইচ্ছা পরিচ্ছদের নগ্নতার মধ্যদিয়ে প্রকট হয়ে উঠছে আজ। কোন বিশেষ চিত্রতারকার ভংগিমায় শাড়ি পড়ার সাথে সেই তারকাটির সাথে নাড়ীর যোগ অনুভব করে এযুগের অষ্টাদশীরা। বৃদ্ধা ঠাকুমা থেকে ত্রয়োদশী

নাতনী ভাগাভাগি করে নিয়মিত সিনেমা পত্রিকা পড়ে। সিনেমা দেখার অর্থ না দিতে পারায় স্ত্রীর হাতে লাঞ্ছিত হন দরিদ্র গৃহস্বামী। স্বাধীন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কর্ণধারেরা আজ ম্যাটিনি শোয়ের লাইনের গোকুলে বেড়ে চলেছে।

নৌকার মাঝি যে গান গেয়ে নৌকা বাইত, বাউল তার একতারায় যে সুরধ্বনিত করে তুলত, যে গান নবান্নের আবাহনী উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তুলত, সে গান সে সুরকে যেন আমরা চিরতরে নির্বাসন দিয়েছি। বছরের কয়কদিন পাণ্ডেল বেঁধে মহানগরীর পার্কে সংস্কৃতির চাষ করলেও আমরা কাণা দৈত্যের গ্রাস হতে সংস্কৃতিকে বাঁচাতে পারিনি। তাই প্যাণ্ডেলের সব গান বার হয়ে এসেছে মাইক্রোফোন যন্ত্রটির ভেতর থেকে, হৃদয় থেকে নয়।

তাই সংস্কৃতির এই নাভিশ্বাসের যুগে আমরা সংস্কৃতিকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে যে ইন্দ্রিয়বিলসনেরই একটা অঙ্গ করে বসে আছি, তা ইতিহাসেরই অনিবার্য পরিণতি। যতদিন না আমরা চলচ্চিত্রের গ্রাস থেকে জীবনকে বাঁচাতে পারব ততদিন সংস্কৃতির সামগ্রীক মূল্যায়ন কোনমতেই সম্ভবপর হবে না। 'সেদিন আজি কোন ঘরে' তা জানিনা তবে ইতিহাসের দাবীতেই যে ইতিহাসের বিবর্তন ঘটবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দিহান।

পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে শিশিরকুমার

ভাদ্র সংখ্যার সমকালীনে রাখাল ভট্টাচার্যের 'জাতীয় নাট্যশালা' প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। যে কথাগুলি বলা একান্ত প্রয়োজন ছিল, 'রক্ষণশীল' 'সেকেলে' গোঁড়া ইত্যাদি সম্বোধনে ভূষিত হবার আশঙ্কা থাকলেও সাহস করে সেই কথাগুলি বলার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জাতীয় নাট্যশালার পথনির্দেশ তিনি করেননি, অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই নিজেকে বোধহয় অনধিকারী বিবেচনা করেছেন তিনি। তবু আমাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে উদাসীনতার কথা যা বলেছেন সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমরা একমত।

জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গেই নাট্যাচার্য শিশিরকুমার কি বলতেন সে কথা এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। তিনি প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন যে, আমরা আমাদের অতীতের কোন খোঁজই রাখিনা। বলতেন—মানলুম গিরিশবাবু খুব ভাল নাটক লেখেননি, দ্বিজুবাবু তাঁর চেয়েও খারাপ লিখেছেন। কিন্তু ওরকম খারাপ নাটকই বা লেখা হচ্ছে কই? তিনি একথাও বলতেন—ভাল নাট্যকার হতে গেলে দেশের মাটির সঙ্গে যোগ থাকা দরকার কিন্তু বিদেশী নাট্যকারদের নাটক না পড়াই ভাল। পড়লেই অনুকরণ করে বসবে। বলতেন—নতুন নাটক বলতে নবনাট্যওয়ালাদের প্রথমেই মনে পড়ে নীলদর্পণের কথা। অথচ নীলদর্পণ হয়েছে ১৮৭২ সালে। গিরিশবাবুর শ্রীবৎসচিন্তা পড়ে দেখ, মনে হবে আজকের কথাই লিখেছেন। পুতুল খেলার প্রসঙ্গে ইবসেনের নাটক সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বলেছিলেন—নোরাও আমায় করতে বলেছিল কিন্তু ওরা ভুলে যায় ঘটনাটা ১৮৭৮ সালের। তারপরে শুধু ওদের দেশেই নয় আমাদের দেশেও আরও শক্তিশালী নারী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। কাজেই নোরাও ডেটেড হয়ে গেছে। আজকের দিনে ইবসেন কেন শ'-ও ডেটেড হয়ে গেছেন। আমার কথা বিশ্বাস না হয়ত স্যার চার্লস মেরিয়টের

লেখা পড়ে দেখ। জাতীয় নাট্যশালার কর্মপন্থার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মত দিয়ে গেছেন তিনি, বলেছেন—আমাদের দেশে থিয়েটার এলো হঠাৎ, বিদেশীদের থিয়েটার দেখে আমারও করতে পারি দেখাতে। ফল কিন্তু তাতে ভাল হয়নি। যাত্রার যে একটা ট্রাডিশন ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেল। যাত্রাটাও থিয়েটারের নকল করে হয়ে গেল থিয়েট্রিকাল যাত্রা। মতি রায় আর মথুর শাই যাত্রাকে বিকৃত করলেন।

অথচ থিয়েটারের উন্নতি করতে হলে থিয়েটারকে যাত্রাই জড় করতে হবে। যাত্রার কাছে নিয়ে গিয়ে নানারকম এক্স্পেরিমেণ্ট করতে হবে। কিন্তু সে থিয়েটারের চেহারাটা কেমন হবে? চারিদিক খোলা বোধ হয় চলবেনা কারণ অভিনেতাদের ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে হলে অসুবিধেই হবে। তিনদিক খোলা স্টেজ নিয়ে পরীক্ষা চলতে পারে।

তবে এক্‌জিট এনট্রান্স কেমন করে হবে? যাত্রায় আসরের মধ্যে বসে পড়ত আবার দরকার হলে উঠে পড়ত। কিন্তু থিয়েটারে বোধহয় তা চলবে না, দেখতে খারাপ লাগবে। দূর থেকে আসাটাও বোধহয় খুব সুবিধে হবে না। জাপানে ঐ জন্যে টানেল ব্যবহার করে। তার পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোনটায় সুবিধে হয়।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর নট, নাট্য পরিচালক ও প্রযোজক হিসাবে নাট্যশালার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা একেবারে উপেক্ষা করা বোধহয় উচিত হবে না। বরং তা পরীক্ষা করে দেখাই বোধহয় সমীচিন হবে। অবশ্য হাতে কলমে কাজ করার পর তাঁর মতের পরিবর্তন করবার স্বাধীনতা তিনি স্বীকার করেছেন, কাজেই আমরা সম্পূর্ণ নিয়মে বাঁধা থাকবনা। নাট্যাচার্যও তাঁর পরিকল্পনাকে 'অপরিবর্তনীয় পবিত্র' কিছু বলে রায় দেননি।

সারাজীবন যিনি নাটক নিয়ে অভিনয় করেছেন, পড়েছেন, আলোচনা করেছেন; প্রায় সমস্ত বাঙলা নাটক যাঁর নখদর্পণে; সেক্‌স্‌পীয়ারের নাট্যরাজি যাঁর কণ্ঠস্থ; সংস্কৃত সুপরিচিত নাটকের অনেকগুলিই যাঁর পড়া; আধুনিক ইংরেজী নাটকেরও অনেকগুলিই যিনি পড়েছেন; উইলিয়াম, ওনীল, র‍্যাটিগান, মিলার, ইলিয়ট, যিনি পড়েছিলেন এমনকি যাঁর নাম এদেশে প্রায় অপরিচিত সেই বার্থোল্ড ব্রেক্টের নাটক যতগুলি পেয়েছেন পড়েছেন—তাঁকে দেড়খানা উইলিয়ামস, দুখানা ওনীল, কি আধখানা মিলার পড়া মহানাট্যাভিজ্ঞ পণ্ডিতমন্য সমালোচক সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারেন, বলতে পারেন—বুড়ো বয়েসে শিশির ভাদুড়ির বাহাত্তুরে ধরেছিল।

কিন্তু নাটকে যাঁদের ঝোঁক আছে, যাঁরা নাটক বিন্দুমাত্র ভালবাসেন, যাঁরা বাঙলা নাট্যশালার উন্নতির কথা চিন্তা করেন, আশা পোষণ করেন তাঁরা বিদেশী মায়া মরীচিকার পিছনে না ছুটে প্রাজ্ঞজনের কথা অনুসরণ করলে সুফলই পাবেন। মনে রাখবেন, ওদের দেশে আজও সফোক্লিস,

শেষ কথা হ'ল, আমাদের দেশে আমাদের মত করে নাটকের উন্নতি করতে হলে পূর্বাচার্যদের মত শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করাই উচিত।

রবি মিত্র

স মা লো চ না

চার্বাক দর্শন ॥ ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী। পুরোগামী প্রকাশনী। কলিকাতা

ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয়ের "চার্বাকদর্শন" বঙ্গীয় দর্শন সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও গাম্ভীর্যে গ্রন্থখানি হৃদয়গ্রাহী এবং গভীর মননশীলতা ও পাণ্ডিত্যে ইহা প্রোজ্জ্বল। চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শনের একটি উপেক্ষিত শাখা। এই বিভাগে গ্রন্থকারের সুদীর্ঘ সাধনা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রসিদ্ধ। "চার্বাক দর্শন" অবশ্য নূতন রচনা নয়, কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থকারের প্রবন্ধাবলীর কিঞ্চিত পরিবর্ত্তিত সংকলন। তৎ সত্ত্বেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা ও আনুপূর্বিকতা রহিয়াছে এবং ইহারা একটি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া গ্রন্থের আকার লাভ করিয়াছে। গ্রন্থখানি সাধুভাষায় সহজবোধ্য দর্শনালোচনার একটি আদর্শ। ইহাতে চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্ন উত্থাপিত এবং আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সংক্ষিপ্ত। বাগ্‌জাল বিস্তারের চেষ্টা ইহাতে নাই। বিষয়-বস্তুর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাই ইহার লক্ষ্য।

গ্রন্থকার বৈতণ্ডিক, ধূর্ত্ত এবং সুশিক্ষিত এই ত্রিবিধ চার্বাক মতের অবতারণা করিয়াছেন। বৈতণ্ডিক মতই চূড়ান্ত চার্বাকমত। এই মতানুসারে প্রত্যক্ষ ও প্রমাণ নয় অর্থাৎ ইহা সর্বপ্রমানা-প্রামাণ্যবাদী এবং কোন বিষয়েরই নিশ্চিত জ্ঞান অথবা প্রমা সম্ভব নয়। ধূর্ত্ত চার্বাকগণ অবশ্য প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী, অর্থাৎ উহারা একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। ইহারা অনুমান, উপমান, শ্রুতি, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য প্রভৃতি কোন প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। সুশিক্ষিত চার্বাকগণ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য তো স্বীকার করেনই, তদুপরি তাঁহারা ব্যবহারিক জীবনে অর্থাৎ লৌকিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অনুমানকেও প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অলৌকিক বিষয়ে, যেমন ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতিতে উহারা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। দ্বিতীয়তঃ, তিনটি চার্বাকসম্প্রদায়ই ভূতচৈতন্য অথবা দেহাত্মবাদী হইলেও এবং খদির, চূর্ণ ইত্যাদির মিশ্রণ হইতে নূতন তাম্বূলরাগ উৎপাদনের ন্যায় পৃথিবী, জল, আগুন এবং বাতাস হইতে চৈতন্যরূপ নূতন গুণের উদ্ভবে বিশ্বাসী হইলেও, ইহাদের মধ্যে ভৌতিক উপাদান বিষয়ে মত পার্থক্য বিদ্যমান। বৈতণ্ডিক ও ধূর্ত্ত চার্বাক ভূত-চতুষ্টয়ে, যেমন ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ এই চারিটি মৌলিক উপাদানে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত চার্বাক এই চারিটি ভৌতিক উপাদানের অতিরিক্ত ব্যোম বা আকাশরূপ পঞ্চম উপাদানে বিশ্বাসী। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে সুশিক্ষিত চার্বাকমতে সৃষ্টির মূল উপাদান পঞ্চমহাভূত। তৃতীয়তঃ, যদিও প্রথমোক্ত দুইটি সম্প্রদায় কার্যকারণ সম্বন্ধের নিয়ামকত্ব স্বীকার করেন না, তৃতীয় অর্থাৎ সুশিক্ষিত সম্প্রদায় লোকযাত্রা নির্বাহের উপযোগী কার্যকরণ সম্বন্ধ স্বীকার

করিয়া থাকেন। চতুর্থতঃ, দেহাত্মবাদ অংশেও সুশিক্ষিত চার্বাকের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। দেহ আত্মা হইলেও দেহের কোন্ অংশ আত্মা তাহার নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে সুশিক্ষিত চার্বাক আত্মাকে শুধু সাধারণভাবে দেহের সহিত অভিন্ন বলিয়াই ছাড়িয়া দেন নাই। আত্মা যদি দেহেন্দ্রিয়ের সহিতই অভিন্ন হয় তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে ইহা কি মাত্র ইন্দ্রিয়গোলকগুলিরই সমষ্টি? সুশিক্ষিত চার্বাক উত্তর দিলেন যে আত্মা ইন্দ্রিয়গোলক নয়, কিন্তু প্রাণ, কারণ ইন্দ্রিয়গোলক সাধন বা করণ মাত্র এবং কর্ত্তা বা আত্মা হইলেন প্রাণ। ইন্দ্রিয়গণ আত্মা হইলে একই দেহে অনেক আত্মা বা চৈতন্যের সমাবেশ ইহয়া পড়ে। অন্যান্য কারণেও ইন্দ্রিয় আত্মা হইতে পারে না। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলে এই স্মরণের অনুপপত্তি ঘটে। আবার, কোন ইন্দ্রিয়ই যুগপৎ অনেক বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। অথচ যে দর্শন করিতেছে সেই শ্রবণ এবং স্পর্শন করিতেছে এইরূপ অনেক বিষয় গ্রহণ জ্ঞানের বিশেষ ধর্ম্ম। কাজে কাজেই আত্মা ইন্দ্রিয়ের সহিত অভিন্নরূপে গৃহীত হইতে পারে না। প্রাণাত্মবাদী সুশিক্ষিত চার্বাক বলেন যে প্রাণই সকল জ্ঞানের মূল কর্ত্তা। কিন্তু আত্মা প্রাণের সহিতও অভিন্ন হইতে পারে না, কারণ যেহেতু প্রাণ সচেতন নয়, প্রাণের ইচ্ছানুসারে এই দেহযন্ত্র এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম পরিচালিত হইতে পারে না। সুতরাং সুশিক্ষিত চার্বাক প্রাণ হইতে আরও এক ধাপ উপরে উঠিয়া বলিলেন মনই আত্মা এবং মনোময় আত্মাই দেহেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। অধ্যাত্মবাদী দর্শন মতগুলির প্রবল আক্রমণে বার্হস্পত্যগণ দেহাত্মবাদ পরিত্যাগ করিয়া কোন্ কোন্ ক্রম অনুসারে প্রথমে ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, পরে প্রাণাত্মবাদ এবং পরিণামে মন আত্মবাদ স্বীকার করিতে এবং ধীরে ধীরে আধ্যাত্মবাদের দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন গ্রন্থকার চমৎকার-রূপে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ, গ্রন্থকার "সুখবাদ" শীর্ষক আলোচনায় কামাবস্তুর উপভোগেই যে চার্বাক মতে মানুষের লক্ষ্য বা পুরুষার্থ তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দুঃখের দ্বারা সম্ভিন্ন বলিয়াই অথবা সুখের পরিমাণ বা মাত্রা অল্প বলিয়াই যে সুখ উপেক্ষণীয় তাহা নহে। প্রসঙ্গক্রমে এপিকিউরসের সুখবাদ সম্পর্কে চারিটি সূত্রের উল্লেখ গ্রন্থকার করিয়াছেন। চার্বাকগণের স্থূল ও মার্জিত সুখবাদ, ব্যষ্টি অথবা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সুখবাদ এবং সুশিক্ষিত চার্বাকগণের আনন্দবাদ উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রচলিত চার্বাকদর্শন সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকুই জানিয়া থাকি যে চার্বাক একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণরূপে স্বীকার করেন, তাহার মতে ভৌতিক উপাদান চারিটি, দেহই আত্মা বা চৈতন্য, কার্যকারণের কোন নিয়ামকত্ব নাই এবং স্থূল স্বার্থসংকীর্ণ ইন্দ্রিয়সুখই একমাত্র পুরুষার্থ। গ্রন্থকার এই সংকীর্ণ ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে কোন কোন চার্বাক কোন প্রমাণই স্বীকার করেন না, আবার কোন কোন চার্বাক প্রত্যক্ষ তো স্বীকার করেনই, প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমানও স্বীকার করিয়া থাকেন। গ্রন্থকার আরও দেখাইয়াছেন যে সুশিক্ষিত চার্বাক আকাশের ভৌতিকত্ব এবং কার্যকারণ সম্বন্ধের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে চার্বাকমতে শুধু ইন্দ্রিয়সুখই অথবা ব্যক্তিগত সুখই কাম্য নয়, কিন্তু শিল্প, কলা প্রভৃতির অনুশীলন হইতে উৎপন্ন মার্জিত এবং সমষ্টিগত সুখই আমাদের কাম্য। ঘৃণিত ও নিন্দিত চার্বাককে অকুতোভয়ে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার এই প্রচেষ্টা গ্রন্থকারের সংস্কারমুক্ত, উদার ও নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। তবে এই সূত্রে মন্তব্য করা যাইতে পারে যে চার্বাক সুখবাদের সহিত ইউরোপীয় সুখবাদের সার্থক

তুলনামূলক আলোচনা করিলে তিনি পাঠকসাধারণের অধিকতর কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারিতেন। সাধারণতঃ দর্শনগ্রন্থে আমরা চার্বাকের যে রূপটির সহিত পরিচিত হইয়া থাকি তাহা চার্বাকের যথার্থ রূপ নয় কিন্তু বিকৃতরূপ। রাধাকৃষ্ণনের এই উক্তি তাঁহার ভারতীয় দর্শন গ্রন্থে উক্তিতেই মাত্র নিবদ্ধ রহিয়াছে, কারণ ইহা যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। গ্রন্থকার এই অসামঞ্জস্য দূর করিয়াছেন। গ্রন্থকারের "চার্বাক দর্শনে" ইহা যুক্তি সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি চার্বাক দর্শনের প্রকৃত রূপটি প্রকট করিতে চেষ্টা করিয়া চার্বাকদর্শনজিজ্ঞাসুকে কূপমন্ডুকতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

প্রমাণাংশে গ্রন্থকার চার্বাকমতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার গ্রন্থের "জয়রাশি ও তত্ত্বোপপ্লব সিংহ" শীর্ষক অধ্যায়টি উল্লেখযোগ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "বিতন্ডা-বাদ" এবং প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদ অধ্যায় দুইটি। পর্যালোচনা বা পরমতদূষণই বৈতণ্ডিক চার্বাকের প্রধান লক্ষ্য। জয়রাশি সর্বপ্রমাণাপ্রামাণ্যবাদী, অর্থাৎ তিনি কোন প্রমাণই, এমন কি প্রত্যক্ষত স্বীকার করেন নাই। এই প্রসঙ্গে জয়রাশি প্রদত্ত যুক্তিগুলি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। লোকায়ত মত বলিতে বিতন্ডাবাদ বুঝায় কিনা গ্রন্থকার এই প্রশ্নটির বিশদ আলোচনা করিয়া সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। বিতন্ডা কাহাকে বলে বুঝিতে হইলে তর্ক কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রৌত এবং তার্কিক ভেদে দুই শ্রেণীর দার্শনিকের কথা উঠিয়াছে। জৈমিনি ও পাণিনি শ্রৌত কিন্তু রামানুজ ও মাধ্বসম্প্রদায় প্রচ্ছন্নতার্কিক, এবং কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণাদ প্রভৃতি তার্কিক। আবার শ্রৌত দার্শনিকগণের সকলেই আস্তিক, কিন্তু তার্কিক-গণের মধ্যে কেহ কেহ আস্তিক এবং কেহ কেহ বা নাস্তিক। আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই প্রকার তার্কিকের ভেদনির্ণয় প্রসঙ্গে বাদ, জল্প ও বিতন্ডা এই তিন প্রকার কথা কাহাকে বলে তাহা আলোচিত হইয়াছে। বিতন্ডা শব্দের অর্থ যে কোনও রূপ দুষ্ট বিচার বা শুষ্ক তর্ক। লৌকায়তিকগণ তাহাদিগের মত স্থাপনের জন্য প্রধানতঃ বিতন্ডার আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বৈতণ্ডিক আখ্যা লাভ করেন। বেদবিরোধী ঋষিগণই আদি বৈতণ্ডিক বা হৈতুক। চার্বাক ও বৈতণ্ডিক অভিন্ন নয়, কারণ চার্বাক একটি বিশেষ দার্শনিকমত, পক্ষান্তরে বিতন্ডা একটি বিশেষ বিচার পদ্ধতি। যুক্তি বা হেতু দেখাইয়া যাহারা বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দা করিয়াছেন তাহা-দিগকেই বৈতণ্ডিক বা হেতুবাদী বা লোকায়ত বলা হইয়াছে। মোটের উপর গ্রন্থপাঠ করিলে সাধারণ পাঠক ন্যায় সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিবেন, কারণ প্রমাণাংশের আলোচনায় গ্রন্থকার অন্বীক্ষকী শাস্ত্রকে সর্বশাস্ত্রের প্রদীপরূপে প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই।

গ্রন্থকার "দেশভাষা ও জয়রাশি" নামক আলোচনায় সাধু এবং অসাধু ভাষার প্রতিপাদকত্ব এবং প্রয়োগার্হত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন। মীমাংসা ও বৈয়াকরণ মতে সাধুবোধ বা সাধুশব্দ হইতেই শুধু অর্থ প্রতিপত্তি হয়। চার্বাকগণ এই মত অস্বীকার করেন এবং অসাধু ভাষাকে সাধুভাষার সহিত সমান মর্যাদা দিয়া থাকেন। "শব্দপ্রামাণ্যখণ্ডন" পরিচ্ছেদে জয়রাশির শব্দপ্রামাণ্যখণ্ডনের পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা স্থান লাভ করিয়াছে। পদের বাচকত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না; শ্রুতির বা শব্দপ্রমাণের আপ্তত্ব অপ্রত্যক্ষ বিষয়, সুতরাং অবিশ্বাস্য; বেদ অপৌরুষেয় বা নিত্য নয়; বেদোৎপন্ন জ্ঞান অবাধিতও হইতে পারে না, কারণ ধারাহিতত্বের জ্ঞান অপ্রাপনীয় এবং বাধকাভাব প্রমাণা-সিদ্ধ; বেদবোধিত জ্ঞান নির্বিষয়ক, সুতরাং ভ্রান্ত বা মিথ্যা; বেদবোধিত জ্ঞান যথার্থ নহে, সুতরাং বেদ প্রমাণ নহে। "প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদ" অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দের মধ্যে কোনটিই প্রমাণ

নয় এই বৈতণ্ডিক মতের উল্লেখ করিয়া ধূর্ত চার্বাকগণের প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ববাদিসম্মত। অনুমান প্রত্যক্ষের পরবর্তী। উপাধিশূন্য অনুমানই নির্দোষ। উপাধিশূন্যতা নির্ণয় অসম্ভব, সুতরাং নির্দোষ ও অসন্দিগ্ধ অনুমানও অসম্ভব। শব্দ বা উপমানের দ্বারাও ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারেনা। অনুমান স্বীকার না করিলে লোকব্যবহার অচল হইয়া পড়ে এই আপত্তির উত্তরে ধূর্ত চার্বাকগণ বলিয়া থাকেন যে লোকযাত্রানির্বাহের জন্য সম্ভাবনা স্বীকার করা যাইতে পারে। সুশিক্ষিত চার্বাকগণ কিন্তু অনুমানের লৌকিক প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান গ্রহণ করেন না কিন্তু পূর্ববৎ ও শেষবৎ অনুমানের লৌকিক প্রামাণ্য গ্রহণ করেন।

গ্রন্থকার বৈদিক, উপনিষৎ ও দর্শন সাহিত্যে স্বভাববাদের মূল উৎস অনুসন্ধান করিয়া বার্হস্পত্য, লৌকায়তিক বা নাস্তিক চার্বাকগণের স্বভাববাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "বৃহস্পতি ও চার্বাক" শীর্ষক আলোচনায় চার্বাকসম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক বৃহস্পতির সঠিক পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতি প্রণীত সূত্রগ্রন্থ অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, মৈত্রায়নী উপনিষদ, মহাভারত, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ প্রভৃতির সাহায্যে চার্বাকসম্প্রদায়গুরু বৃহস্পতি কে তাহা আলোচিত হইয়াছে। বৃহস্পতি কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম বলিয়া মনে হয় না। ইহা ঔপাধি বিশেষ, যেমন ব্যাস, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি। দেবগুরু হইয়াও বৃহস্পতি কিরূপে অসুর শাস্ত্রের প্রবর্তক হইতে পারেন তাহাই বিস্ময়কর। উপসংহারে নাস্তিক, পাষন্ড, লোকায়ত, উচ্ছেদবাদ, চার্বাক প্রভৃতি কথাগুলির সংজ্ঞানির্দ্ধারণের পর চার্বাকমত ইহার কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা আলোচিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে চার্বাক বার্হস্পত্য, নাস্তিক, লোকায়ত এবং পাষন্ড। পরিশিষ্টে বৃহস্পতি, লোকায়ত, চার্বাক, পুরন্দর, কম্বলাস্বতর, প্রভৃতির অর্দ্ধশতাধিক সূত্র সংগৃহীত হইয়াছে। চুয়াল্লিটি সূত্র নানা স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার বার্হস্পত্যসূত্রের একটি সুষ্ঠু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রমাণাংশের আলোচনা প্রশংসনীয়। মুখ্য প্রমাণশাস্ত্র ন্যায়দর্শনের আলোকে এই আলোচনা সার্থক হইয়াছে। এইরূপ একটি দুরূহ বিষয়ের সহজ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থকার পাঠককে কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন। প্রমেয়াংশের আলোচনা সুন্দর হইলেও বড়ই সংক্ষিপ্ত। ভূত-চতুষ্টয়ের এবং সুশিক্ষিত চার্বাক কর্তৃক স্বীকৃত পঞ্চম ভূত আকাশের আলোচনা আরও বিস্তৃত হইলে পাঠক আরও উপকৃত হইতেন। এই ভূতচতুষ্টয় হইতে কি প্রকারে এবং কিরূপ ক্রম অনুসারে বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্ট এবং বিধৃত হইয়া আছে এই জাতীয় প্রশ্ন দার্শনিক পাঠকের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। অর্থাৎ প্রশ্ন এই যে চার্বাকগণের দর্শনকে কোন বিশ্বদর্শন আখ্যা দেওয়া যায় কিনা, অথবা চার্বাকগণ শুধু মনস্যাকেল্পিক দর্শনেই পরিতৃপ্ত। যদি তাহাই হয় তবে পাশ্চাত্য জড়বাদের তুলনায় চার্বাকপাদ অনেক অশ্চাৎপদ বলিয়া বিবেচিত হইবে। পরিশিষ্টে সংকলিত চুয়াল্লিটি সূত্রে বিশ্বদর্শনের কোন সম্ভাবনা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।

'সংশয়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদ' অধ্যায়ে মনে হয় গ্রন্থকার এই দুইটি বাদকে যথাক্রমে পাশ্চাত্য Scepticism এবং Agnosticism এর সহিত সমার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয় তবে চার্বাকবাদকে অজ্ঞেয়বাদ বলা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা তাহা ভাববার বিষয়। Agnosticism

পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব বা সত্তা স্বীকার করে, শুধু উহার জ্ঞেয়তা অথবা জ্ঞানগম্যতাই অস্বীকার করে। চার্বাকদর্শন নিশ্চয়ই কোন পরমতত্ত্বের-যাহা নিত্য ও শাশ্বত—সত্তা স্বীকার করে না। সুতরাং উহার জ্ঞেয়তা অথবা অজ্ঞেয়তার প্রশ্ন চার্বাকদর্শনের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। 'কেন' উপনিষদকেও অজ্ঞেয়বাদী বলার যৌক্তিকতা বিবেচ্য। পরমতত্ত্ব অজ্ঞেয় এই ইঙ্গিত উহাতে রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রেত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ.....ইত্যাদি শ্লোকে অজ্ঞেয়তার লেশ মাত্র নাই। সুতরাং সমাধান এই যে পরমতত্ত্ব, বুদ্ধি অথবা তর্কের অনধিগম্য, যদিও উহা অনুভবগম্য অথবা সাক্ষাৎ প্রতীতিগোচর। যস্য মতং তস্যামতং প্রভৃতি অংশেও এই দুই প্রকার জ্ঞানের ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়—তাহা না থাকিলে ঋষির উপলব্ধি নিঃসৃত শ্লোক দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে।

সে যাহা হউক, বাংলা দর্শন সাহিত্যে যে 'চার্বাকদর্শন' বিশেষ মর্য্যাদার আসন লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিষয়বস্তুর প্রচুর পরিবেষণ, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার, দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা এবং চার্বাকদর্শন সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদের বহু উচ্চভূমিতে বিচরণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে গ্রন্থখানি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস। ঐতিহাসিক ঘটনাবিন্যাস গ্রন্থের সামান্য অংশই জুড়িয়া আছে এবং তাহাও তত্ত্বাংশের উপকরণরূপে। অর্থাৎ দার্শনিক আলোচনাই গ্রন্থের মুখ্য লক্ষ্য, ঐতিহাসিক আলোচনা নয়। গ্রন্থকার বৃহস্পতিমতের পুনরুদ্ধারের আবশ্যকতা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "অনান্য দার্শনিকগণও চার্বাকের মতকে 'পূর্বপক্ষ' রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বপক্ষ অস্পষ্ট থাকিলে 'উত্তরপক্ষ' এবং 'সিদ্ধান্ত' স্পষ্ট হয় না। ভারত বৃহস্পতিকে ভুলিয়া 'স্ব'কে এবং বস্তু বিশ্বকে দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিয়াছে; তাই সে আজ দৈন্য পীড়িত ও নির্জীব"। তাঁহার এই সাবধান বাণী সার্থক হউক এবং বৃহস্পতিমতের পুনরুজ্জীবনের সহিত ভারতীয় দর্শন পুনর্জ্জীবিত হউক গ্রন্থকারের এই কামনা পূর্ণ হইলেই মঙ্গল।

পরেশনাথ ভট্টাচার্য

প্রকাশিত হল

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

নারীর উক্তি

"আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অভদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ না করে থাকা যায় না। সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করবার সময়ও কি জুতো জোড়াটার সঙ্গে আমরা—বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ দলাদলির ভাবটা বাইরে রেখে আসতে পারি নে? অবশ্য সাহিত্য চর্চার যদি কোনো উচ্চ লক্ষ্য থাকে তো সে কেবল লীলাকমলের বাজনে অবলীলাক্রমে সাধিত হবে না, তা জানি। অকল্যাণকে তাড়াতে হলে মধ্যে কুলোর বাতাসও দেওয়া চাই। কিন্তু তীক্ষ্ণ কক্ষ্ম আর মারাত্মক আর যে-কোনো প্রকার ভাষার অস্ত্র সাহিত্যরথী ব্যবহার করুন-না কেন, ইতরতা বা রূঢ়তার অস্ত্রপ্রয়োগ এস্থলে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। যিনি বাণীর সেবক হবার স্পর্ধা রাখেন, অশুদ্ধ বাণী ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে বিশেষরূপে বিসদৃশ নয় কি?"

এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'ভদ্রতা' নামক নিবন্ধে লেখিকা উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন; সাহিত্যে সমাজে বা ব্যক্তিগত ব্যবহারে শালীনতার প্রয়োজন কতটা তার খোলাখুলি আলোচনা এতে আছে। তা ছাড়া, 'বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার' 'সম্বন্ধ' 'আদর্শ' 'পাটের-বিল' বঙ্গনারী—কঃ পন্থা, কি ছিল, কি হল, কি হতে চলিল' ইত্যাদি। প্রবন্ধে লেখিকার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা লব্ধ সহজ ও সরস অভিমত গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করেছে।

নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অবশ্যপাঠ্য

মূল্য ২·৫০ টাকা

সে খি কা র অ ন্যা ন্য ব ই

বাংলার স্ত্রী আচার

পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের বিবাদ-পূর্ব বিবাহ-কালীন ও বিবাহ-উত্তর স্ত্রীআচারসমূহের বিবরণ। গ্রন্থশেষে বিবাহের গান সন্নিবিষ্ট।

মূল্য ১·৩০ টাকা

রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিবেণী সংগম

রবীন্দ্রনাথ গানের ক্ষেত্রেও কিরকম পরকে আপন করে নিতে পেরেছেন, চলিত কথায় যাকে গানভাঙা বলা হয়—তার পরিধি কত বিসৃত এবং তাতেও কিরকম অপরূপ কারিগরি দেখিয়েছেন, দৃষ্টান্তসহ তার আলোচনা। প্রত্যেক সংগীত-রসিকের অবশ্য পাঠ্য বই।

মূল্য ০·৮০ নয়া পয়সা

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭